দ্বিতীয় সোপান।

শ্রীপ্রাণনাথ প্রেমিকরতন

প্রণীত।

শ্রীবামদেব দত্ত কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

"সমগ্র শব্দশাস্ত্র এক দিকে,—আর এক দিকে শুধু ঐ কথা—
'ভালবাসা,' রাখিয়া ওজন করিলে শেষের দিকটা
নিশ্চয়ই ভারী বলিয়া বোধ হইবে।

ইতি সন্ন্যাসী।

কলিকাতা

নবুন্নত-সাহিত্যপ্রচারী কোং,
১২৭ নং,—মস্‌জীদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট,

সন ১২৯৭ সাল।

 [মূল্য ।৹ আট আনা মাত্র।

ভালবাসা।

দ্বিতীয় সোপান।

শ্রীপ্রাণনাথ [illegible]

প্রণীত।

শ্রীবামদেব দত্ত কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

"সমগ্র শব্দশাস্ত্র এক দিকে,—আর এক দিকে শুধু ঐ কথা—
'ভালবাসা,' রাখিয়া ওজন করিলে শেষের দিকটা
নিশ্চয়ই ভারী বলিয়া বোধ হইবে।"

ইতি সন্ন্যাসী।

কলিকাতা

সমুন্নত-সাহিত্যপ্রচারী কোং,
১২৭ নং,—মসজীদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট,

সন ১২৯৭ সাল।

 [মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

ভালবাসা।

দ্বিতীয় সোপান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রসিকরঞ্জনের রসভাষা সমাপ্ত হইবামাত্র, অপরিচিত এক যুবক বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। তাঁহার বর্ণ মসীকৃষ্ণ, চক্ষু লাল, মাথার মাঝে সোজা সিঁথি, বুকে বাঁকা ধরণে চাদর বাঁধা, বোতামের কোলে গোলাব ফুল গোঁজা, বামহস্তে ল্যাভেণ্ডারমাখা রুমাল, দক্ষিণ হাতে খাসা ছড়ি। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—

সভ্যগণ!—ভালবাসার বক্তৃতা করা যার তার কাজ নয়। ভালবাসায় যার অভিজ্ঞতা নাই, ভালবাসায় যে পোড় খায় নাই, ভালবাসায় যে পাকে নাই, অন্ততঃ আট দশটা

ভালবাসায় যে উলটী পালটী খায় নাই, ভালবাসার রহস্য সে কিছুই বুঝে না। যে টপ্পা উড়াইতে জানে না, যে তব্‌লায় চাটি মারিতে পারে না, যে তেরেকিটি তাক্‌ সাধে নাই, যে রসিকতা জানে না, ভালবাসায় তার অধিকার নাই। যে লাজুক, যে ভাবুক, যে নির্জ্জনপ্রিয়, যে মজ্‌লিস্‌ মারে নাই, যে নেসার আস্বাদ জানে না, সুরা-সেবন যে করে নাই, মারকুলি যে খায় নাই—

বাড়াবাড়ি দেখিয়া, আমি সভাপতিরূপে উত্থিত হইয়া ইহাঁর বক্তৃতায় বাধা দিয়া বলিলাম, "মহাশয়! ক্ষান্ত হউন, ক্ষমা করুন। অনর্থক বাজে ভাঁড়ামি শুনিবার জন্য এ সভা আহূত হয় নাই। আপনার রসিকতায় রসবোধ করিবার লোক এসংসারে যথেষ্ট আছে, অতএব যথাস্থানে গিয়া আপনি যশোলাভ করিতে থাকুন। এ সভার সভ্যগণ এখন বোধ হয় সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনিবার জন্য অধীর হইয়াছেন। অতএব আর কালহরণ না করিয়া, আমি সানুনয়ে সন্ন্যাসী মহাশয়কে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করি।"

অতঃপর সন্ন্যাসী সমুত্থিত হইয়া, চক্ষু বুজিয়া কিয়ৎক্ষণ মনে মনে ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যান শেষ হইলে, নিম্নলিখিত চিরপরিচিত কবিতাটি উচ্চারণ করিয়া বৃন্দাবনবিহারীর চরণে প্রণাম করিলেন—

নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধরসুধাপানশালিনে বনমালিনে॥

অনন্তর সভাপতি ও সভ্যগণকে যথাবিহিত সম্বোধন পুরঃসর বলিতে লাগিলেন—

সন্ন্যাসীর মুখে আপনারা ভালবাসার বক্তৃতা শুনিবেন, সাধ করিয়াছেন। জানি না, কেমন করিয়া সে সাধ আমি মিটাইব? আমার চিত্ত নীরস, আমার শক্তি পরিমিত, আমার ভাষা দুর্ব্বল, আমার প্রাণ বৈরাগ্যে বিহ্বলীকৃত। আমার দ্বারা আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? ভালবাসার মর্য্যাদা আমার দ্বারা রক্ষিত হইবে কি? সংসারগহনে আমি বৃক্ষচ্যুত গলিতপত্র, ভবার্ণবে আমি প্রবহমান ক্ষুদ্র তৃণ, মর্ত্ত্যধামে আমি ম্রিয়মাণ কীটাণুকীট তুল্য। ভালবাসার মহিমা আমি কেমন করিয়া বুঝাইব? সুখসাধে আমি জলাঞ্জলি দিয়াছি, আশা উদ্যম আমি বিসর্জ্জন করিয়াছি, ঘর সংসার আমার পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, বিশ্বচরাচর আমার পক্ষে অরণ্যময় হইয়া গিয়াছে, ভালবাসার তত্ত্ব আমি আর কেমন করিয়া দিব? পথ আমার গৃহ, অরণ্য আমার আশ্রয়, ভিক্ষা আমার সম্বল, চিন্তা আমার সঙ্গিনী, বিষাদ আমার বন্ধু, যন্ত্রণা আমার কুটুম্বিনী, ভালবাসার রহস্য আমার কাছে আর কি শুনিবেন? এই বিশাল বিশ্বভূমে আমার বলিতে আমার আর কেহ নাই, ভালবাসিতে আমার কেহ নাই, ভালবাসিবে এমন কেহ আমার নাই। ভালবাসার রাজ্যে আমি উদাসীন; সে পক্ষে সকল দিকেই আমার বিষম গোল।

এই দেখুন, প্রথমেই আমার প্রধান গোল, ভালবাসা শব্দটা লইয়া। ভালবাসা শব্দটায় আমার ঘোরতর আপত্তি। কিন্তু দ্বিতীয় বক্তা নবকুমার যে ভাবে উহাকে আপত্তি করিয়াছিলেন, আমার আপত্তি সে ভাবের নহে। আমর আপত্তির

কারণ বরং তাহার ঠিক বিপরীত। ভালবাসা শব্দ রুচি-বিরুদ্ধ বলিয়া যিনি মতঘোষণা করেন, তাঁহার রুচির প্রশংসা করিতে আমি প্রস্তুত নহি। বাঙ্গালা ভাষায় এমন শব্দ যে সৃষ্ট হইয়াছে, এজন্য বাঙ্গালা ভাষাকে আমি গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করি। এমন কোমল পদ, এমন মনোহর মাধুরী শব্দ রহস্যে বুঝি আর নাই। সমগ্র শব্দশাস্ত্র এক দিকে, আর একদিকে শুধু ঐ কথা—"ভালবাসা" রাখিয়া ওজন করিলে, আমার মতে শেষের দিক্‌টা নিশ্চয়ই ভারী বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু এই ভালবাসা শব্দটার বড় অপব্যবহার হইয়াছে। অনেক কথারই এইরূপ অপব্যবহার হইয়া পড়িয়াছে। বল্লাল সেন কুলমর্য্যাদা স্থাপনপূর্ব্বক নিয়ম করিলেন যে, যিনি নবধাগুণবিশিষ্ট, তাঁহারই নাম হইল কুলীন,—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥

কিন্তু আজ ঐ ঘোর কদাচার পশুবৃত্তিপরায়ণ কুল-পাংসন কুলীন বলিয়া সমাজে সম্মান লাভ করিতেছেন।

আবার দেখুন, ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি?

ক্ষমা দয়া দমো দানং ধর্ম্মং সত্যং শ্রুতং ঘৃণা।
বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যং এতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণং॥

এই একাদশ লক্ষণের একটা লক্ষণও যাঁহাতে নাই, সকলই যাঁর অলক্ষণ, তিনিও আজ যজ্ঞসূত্রমাত্র গলায় দিয়া, ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিতেছেন।

যজন যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা, দান প্রতিগ্রহ, এই ষড়-বিধ কর্ম্মই ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত। যিনি স্বকার্য্য ছাড়িয়া অন্য কার্য্যে আসক্ত হন, যিনি বেদ পাঠ করেন না, মহাত্মা মনু বলিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণ অচিরেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

কিন্তু বঙ্গের ব্রাহ্মণ আজ না করিতেছেন এমন কাজই নাই। আর বেদের সহিত তাঁহার ভাশুর ভ্রাতৃবধূর সম্পর্ক হইয়াছে। অথচ মুখে বলিতেছেন, আমার মোজার ধূলা মাথায় দাও, তোমার পরকালের মঙ্গল হইবে।

গুরু বলিয়া একটা কথা আছে। সে গুরু কাহাকে বলা যায়? গুরু বলিয়া কাহার পায়ে প্রণাম করি?

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

কিন্তু আজিকার যিনি গুরু তিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার বিশ্বব্যাপী চরাচরগুরুর চরণ শিষ্যকে দেখাইবেন কি, কেবল গোল গোল রূপার চাক্তী ও চক্রাকাররূপী লুচির দিকে চাহিয়াই নিজের চক্ষু স্থির।

আচার্য্য কাহাকে বলে?

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥

যিনি শিষ্যকে উপনয়ন করাইয়া, কল্পসহিত সরহস্য বেদ অধ্যয়ন করান, তাঁহার নাম আচার্য্য। কিন্তু বেদ শিখান দূরে

থাকুক, এখনকার দিনে, বেদীতে বসিয়া, বেদের মাথায় যিনি শত সম্মার্জ্জনী প্রহার করেন, তিনিই আচার্য্যপদবাচ্য। শব্দার্থের এরূপ বিড়ম্বনা ইহার অপেক্ষা আর কি হইতে পারে?

ভালবাসা শব্দেরও বিড়ম্বনা ঠিক এইরূপেই হইয়াছে। ভালবাসার নাম যদি আত্মসমর্পণ হয়; পরের প্রাণে আপনার প্রাণ মিশাইয়া দেওয়ার নাম যদি ভালবাসা হয়; পরের অস্তিত্বে আপনার অস্তিত্ব ডুবাইয়া দেওয়াকেই যদি ভালবাসা বলে; যাহাকে ভালবাসিয়াছি সে আর পর নয়, তাহার আত্মায় আমার আত্মায় যোগ হইয়া দুয়ে এক হইয়া গিয়াছে;—ইহ-পরকালে সে যোগভঙ্গ হইবার নহে, সে আর পর হইবার নহে; ইহারই নাম যদি ভালবাসা হয়, তবে ভালবাসা শব্দের যে বিসম বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে, তাহা আর একমুখে বলিয়া শেস করা যায় না।

যার যখন খুসী, যার যাহাকে খুসী, সেই তাহাকে আসিয়া বলিতেছে আমি তোমায় ভালবাসি। পান থেকে চূণটুকু খসিলে যার ভালবাসা টুটিয়া যায়, সেও বলে আমি তোমায় ভালবাসি। বিলাসে বাধা পড়িলে যার বুকে ব্যথা হয়, সেও বলে আমি তোমায় ভালবাসি। ভালবাসার পাত্র দশদিন নজর-ছাড়া হইলে যাহার ভালবাসার ঘোর কাটিয়া যায়, সেও বলে আমি বড় ভালবাসি। তিরস্কারের ভরটুকু যার গায়ে সয় না, সহিষ্ণুতার লেশমাত্র যার অভ্যস্ত হয় নাই, সেও বলে আমি বড় ভালবাসি। এক ফোঁটা জল লাগিলে যিনি গলিয়া যান, রবিকিরণের আঁচ্ লাগিলে যিনি জল হইয়া যান, তিনিও বলেন, আমি বড় ভালবাসি।

লোকের কথায় যে ভালবাসা কমায় বাড়ায়, ছাড়ে ধরে, সেও বলে আমি ভালবাসি। পরের পরামর্শ লইয়া যে ভালবাসার চর্চ্চা করে, সেও বলে আমি ভালবাসি। নূতন দেখিলে পুরাতনে যাহার প্রীতি আর থাকে না, সেও বলে আমি বড় ভালবাসি। ভালবাসার একি কম লাঞ্ছনা?

বিধবা দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া বলিতেছেন, প্রাণনাথ! আমি তোমায় ভালবাসি। সধবা স্বামি-ত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ পূর্ব্বক বলিতেছেন, নায়ক হে! আমি বড় ভালবাসি। বিদুষী বাল্যবিবাহে ঘৃণা করিয়া, যৌবনবিলাসের সাধ মিটাইতে গিয়া বলিতেছেন, ভালবাসিতে কি আমি জানি না? রূপাভিলাষী নিত্য নূতন রূপে মজিয়া ভালবাসার গৌরব রক্ষা করিতেছেন, বিষয়াভিলাষী বিষয়মদে মত্ত হইয়া ভালবাসার সাধ মিটাইতেছেন। নাটকের নায়িকা জলের ঘাটে স্নান করিতে গিয়া হঠাৎ হয় ত পুকুরপাড়ে মেঠো নায়ক দেখিয়া, কলসী ফেলিয়া কাঁদিতে বসিল,—আমি তাবে ভালবাসি। নবেলের নবীনা বালা ঘোর তুফানে জলে ডুবিয়া মরিয়াছিল, মন্ত্রৌষধিবলে পুনর্জ্জীবিত হইয়া, চক্ষু চাহিতে না চাহিতে, মাথার শিয়রে অপরিচিত এক নব যুবককে দেখিয়া, ভালবাসার নেসায় আবার তখনি ঢলিয়া পড়িল, আর মাথা তুলিতে পারিল না! থিয়েটারের অভিনেতা বীর রসের [illegible] করিয়া ভালবাসার অভিনয় করিতে থাকেন; অভিনেত্রী ট্যাড়া-বাঁকা টানা সুরে কথা কহিয়া, আর বেসুরে আবোল তাবোল বকিয়া ভালবাসার রঙ্গে অঙ্গ ঢলি করিয়া দেন। যাত্রার ছোক্‌রা নাচিয়া নাচিয়া

ভালবাসার গান গাহিয়া আসর মাতাইয়া ফেলে; আর নর্ত্তকী আড়নয়নে আঁখি ঠারিয়া, আড়্খেম্টায় পা ফেলিয়া, বারইয়ারীর মজ্‌লিসে ভালবাসার গানে বাবুদের মগজ্ গরম করিয়া তুলে। ভালবাসা পণ্য দ্রব্য হইয়াছে; বটতলায় হাটতলায় ভালবাসার বেচাকেনা চলিতেছে; মাঠে ঘাটে ভালবাসার ছড়াছড়ি হইতেছে; মদের মজ্‌লিসে ভালবাসার মহিমা গীত হইতেছে; বেশ্যালয়ে ভালবাসার বীভৎস লীলা অভিনীত হইতেছে। হায় ভালবাসা! স্বর্গ হইতে নামিয়া, পৃথিবীর মাটিতে মিশিয়া তুমি কেন এমন মাটি হইতে আসিয়াছিলে?

সকল দিকেই ভালবাসার এইরূপ ভণ্ডামি, সর্ব্বত্রই ভালবাসার এমনি বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। যে আমার ঘোর শত্রু, অন্তরে অন্তরে যে আমায় অধঃপাতে দিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে, সেও মুখে বলে যে আমি তোমায় ভালবাসি। যে আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে, যে আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে, সেও বলে আমি তোমায় ভালবাসি। ইংরেজ অম্লানবদনে বলেন, ভারতবাসীকে আমি বড় ভালবাসি। যে ইংরেজ্ আমাদের ধন-মান, আমাদের অন্ন-বস্ত্র, আমাদের শিল্পসাহিত্য, আমাদের স্বাস্থ্যসামর্থ্য, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি, আমাদের গৌরব-কীর্ত্তি, আমাদের রীতি-নীতি, আমাদের ভক্তি-প্রীতি, আমাদের সুখ-সম্পদ, আমাদের আশা-ভরসা, আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম, আমাদের ইহ-পরকাল সর্ব্বস্বই স্বতঃ পরতঃ হরণ করিয়া লইতেছেন; তাঁহার মুখে যখন ভালবাসার এত ভাণ্, এত আস্ফালন, তখন আর অন্যের কথা কি বলিব?

ইংরেজের কথা কেন, ভালবাসায় এই ভণ্ডামি, আমাদের স্বদেশবাসিদিগের মধ্যেও ত শতসহস্র প্রকারে দেখিতে পাই। আধুনিক দেশহিতৈষীর দৃষ্টান্তে, কথাটা আরও স্পষ্টপ্রকারে বুঝা যায়। স্বদেশকে ভালবাসি বলিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া যাঁহারা মেদিনী কাঁপাইয়া বেড়ান, বাস্তবিক দেশের কোন খান্‌টাই ত তাঁহারা ভালবাসেন না। দেশের ভাষা দেশের পরিচ্ছদ, দেশের আহার দেশের আচার, দেশের ঔষধ দেশের চিকিৎসা, দেশের আমোদ দেশের ক্রীড়া, দেশের পর্ব্ব দেশের উৎসব, দেশের ধর্ম্ম দেশের শাস্ত্র, কিছুই তাঁহারা ভালবাসেন না; অথচ দেশ-ভক্তির ধ্বজা লইয়া দেশ বিদেশে তাঁহারা গলাবাজি করিয়া বেড়ান। দেশের সকল বিষয়েই যাঁহাদের নিদারুণ বিদ্বেষ, তাঁহারাই বলেন দেশকে আমরা বড় ভালবাসি। এ ভণ্ডামি কি ভালবাসার ঘোরতর বিড়ম্বনা নয়?

ইংলণ্ডের কবি বলিয়াছেন,—

"England! with all thy faults I love thee still."

"ইংলণ্ড! তোমার যত দোষই থাকুক্ আমি তবু তোমায় ভালবাসি।" কথাটা বিদেশের হইলেও ভালবাসার মহামন্ত্র বটে। ভালবাসার ব্যাখ্যায় কথাটা কিন্তু আমি আর একটু উঁচু করিয়া বলিতে চাই। যাহাকে ভালবাসি, তাহার দোষ থাকে থাকুক, তবু তাহাকে ভালবাসি, একথা আমি বলিতে চাই না। আমি বলি যাহাকে ভালবাসি, তাহার দোষ থাকিতেই পারে না। তাঁহার দোষ পৃথিবীর লোকে দেখে দেখুক, আমি ত দেখিতে পাই না, দোষ

দেখিতে যে পায়, ভালবাসিতে সে জানে না, ভালবাসার ভাব তার ষোল কলা পূর্ণ হয় নাই। আমি যাহাকে ভালবাসি, সে যে আমার আপনার জিনিস, তাহার মন্দ কি আবার কিছু থাকিতে পারে? তাহার সকলই ভাল, সকলই সুন্দর, সকলই সবার উপর। তার খাঁদা নাক্, তার চাকামুখ্, তার গোলচক্ষু, তার ছোট চুল্ সকলই সুন্দর, সকলই মনোহর। তার যেখানে যে তিল্‌টি, যে আঁচিল্‌টী আছে, সে সকলই রূপের সজ্জা, দেহের ভূষণ। সেগুলি যার নাই, সে সুন্দর হইলেও, তাহার সৌন্দর্য্য যেন অঙ্গহীন বলিয়া আমার চক্ষে প্রতীয়মান হয়। সৌন্দর্য্য আর কিছুই নহে, আমি যাহা ভালবাসি, তাহাই ত সুন্দর। আমি যাকে ভালবাসি, তার রং যদি কাল হয়, তবে আমি বলি কৃষ্ণবর্ণই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠবর্ণ। তোমাদের চক্ষে সে কাল বলিয়া ভাল লাগিতে না পারে, কিন্তু আমার কাছে সে কালরূপেই জগৎ আলো করিয়া আছে। তোমরা কাল কাল বলিয়া আমার কাণের কাছে কর্কশবাক্য বর্ষণ করিও না; সৌন্দর্য্যের সার তোমরা বুঝ না, কালর মহিমা তোমরা জান না। জটিলার প্রতি কৃষ্ণপ্রণয়িনী রাধিকার তিরস্কারবাক্যে ভালবাসার কি মর্ম্মোচ্ছ্বাস স্ফূরিত হইতেছে দেখুন,—

সে কি কাল তুই দেখে এলি কাল যায়?
কালের কাল যায়, সে কালপূজায়।
সেই কাল দরশনে জীবের কাল দরশন যায়।
সেই কাঁলরূপ জেনে ভালরূপ, শশীভাল যায় ভাল
বাসে; তোর ভাল লাগে না তায়॥

দেবাদিদেবের চরণপ্রাপ্তির আশয়ে পার্ব্বতী কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। ছলনা জন্য স্বয়ং মহাদেব বিট্‌লে বামুনের বেশ ধরিয়া, তাঁহার কাছে গিয়া কতমতে শিবনিন্দা করিতে লাগিলেন। শুনিয়া তপস্বিনী রুষিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "ঠাকুর! যাও, যাও বিশ্বমূর্ত্তি মহাদেব, তাঁহার মহিমা কে বুঝিবে? কিন্তু বুঝি আর না বুঝি, বিবাদে কাজ নাই। তুমি যাই বল, তিনি যেমনই হুউন না, আমার চিত্ত তাঁহাতে একান্ত ডুবিয়াছে, আমি কারও কথা শুনি না। প্রেমের ব্যাপারে লোকের কথায় কর্ণপাত করিতে গেলে চলে না।"

মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং
ন কাম বৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে ॥

ভালবাসা কাহারও কথার অপেক্ষা রাখে না। ভালবাসা রূপের অপেক্ষা করে না। ঐ নবীন-নধর সুঠাম-সুন্দর রাজপুত্র অপেক্ষা আমার এই গোড়ে-গোরদা খোঁড়া ছেলে-টিও আমার চক্ষে সুন্দর নয় কি? আর আমার এই উট্‌-কপালী উনন্‌-মুখীর কাছে তোমার সিংহাসনবিলাসিনী রূপসী অপ্সরা কখনও দাঁড়াইতে পারে কি? ভালবাসা গুণেরও অপেক্ষা করে না। ভালবাসা গুণসাপেক্ষ বলিয়া যাঁহারা বুঝাইতে চাহেন, আমার মতে তাঁহারাও মহাভ্রান্ত। আমার এই হ্যাণ্ডনোট্‌-কাটা জেল্‌ফেরৎ জুয়াচোর পুত্র অপেক্ষা তোমার সোণারচাঁদ সবজজপুত্রকে কি বেশী ভাল-বাসিতে পারি? আমার প্রেয়সী উঠিতে বসিতে আমায় মুখনাড়া দেন, রাত্রিকালে রাগ করিয়া কতদিন ঘরের

কবাট খুলিয়া দেন নাই, প্রাতঃকাল না হইতে হইতেই তবু গিয়া কেন তাঁহার পায়ে ধরি বল দেখি ?

ভালবাসার নিয়ম অতি দুর্জ্ঞেয়। ঈশ্বরতত্বানুসন্ধায়ীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যেমন বলেন যে আমি এইমাত্র জানিয়াছি যে জগদীশ্বরকে জানা বড় কঠিন, তিনি দুর্জ্ঞেয়; তেমনি প্রেমিককে প্রশ্ন করিলে প্রেমের তত্ব দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই তিনি উত্তর প্রদান করিবেন। প্রেমিক আপনার চিত্তকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছে, তবু জানিতে পারে না যে কেন ভালবাসি। রূপ নাই, গুণ নাই তবু বুঝিতে পারে না যে কেন ভালবাসি। যাহাকে ভালবাসিয়া যন্ত্রণা হয়, ভালবাসিয়াও যাহার মন পাওয়া যায় না, তবুও বুঝে না যে কেন ভালবাসি। এই শুনুন প্রেমিকের মর্ম্মোক্তি—

জানি না যে কেন ভালবাসি !
যতনে যাতনা বাড়ে, তবু তার অভিলাষী।

আবার, সে ভালবাসে কি না বাসে তা বুঝি না তবু তাকে ভালবাসি। তার প্রতিদান চাই না, তাকে ভালবাসিয়া আমি ভাল থাকি, তাকে ভাল না বাসিলে আমি কে জানে কেন থাকিতে পারি না, তাই তাকে ভালবাসি।

বাসে বা না বাসে ভাল, ভাল বেসে থাকি ভাল।

ভালবাসা ভোগ করিবার আশা বিফল হইল ; বাসনার সাগরে আমি চিরকাল ভাসিতে লাগিলাম ; অন্তরের কামনা অন্তরেই রহিয়া গেল, তথাপি তাহাকে ভালবাসি।

কি হলো বিফল আশা বাসনা সাগরে ভাসি ॥

কেন ভালবাসি তা জানি না। ভালবাসার কারণ, তোমরা কেহ আমার কাছে জানিতে চাহিও না; আমি নিজেই তাহা জানি না, আমার চিত্ত জানে না, আমার বুদ্ধি বলিয়া দিতে পারে না। আমি আত্মহারা হইয়াছি, আমি উন্মত্ত হইয়াছি, আমি যন্ত্রণানলে পুড়িয়া মরিতেছি। আমি অকূল পাথারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, তবু আমি ভালবাসি। ইহাই প্রেমিকের রীতি, ইহাঁরই নাম ভালবাসা। ভালবাসার যদি কোন নিয়ম থাকে, তবে তাহা এই যে,—

জানি না যে কেন ভাল বাসি!

ভালবাসার এই সঙ্গীত যিনি রচনা করিয়াছেন, প্রণয়-রাজ্যের মহাকবি বলিয়া তাঁহার পায়ে প্রেমিকে চিরপ্রণাম করিবে। ভালবাসার মূলতত্ত্ব এক কথায় ইহার ভিতর নিহিত আছে; কিশোরীর নবসঞ্চারিত, লজ্জাজড়িত প্রণয়-লীলার ন্যায় কি এক অনির্ব্বচনীয় মাধুরী ইহার স্তরে স্তরে যেন গাঁথা আছে। এই গান সর্ব্বপ্রথম যে দিন আমার কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিয়াছিল, যে দিন আমি গান শুনিয়া মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায়, ভুজঙ্গদংশিতের ন্যায় কাতর হইয়া পড়িয়া-ছিলাম—সে দিন হায়! সে দিন এখন কোথায় চলিয়া গিয়াছে! আজ হঠাৎ গায়কের কলকণ্ঠে সেই পুরাতন সঙ্গীত, সেই চিরমধুর আমার চির-প্রীতিকর সঙ্গীত শুনিয়া আমার সে সময়ের কথা সকলই মনে পড়িয়া গেল। ভাল-বাসার এই সভামধ্যে, ভালবাসার সহস্র ব্যাখ্যা শুনিয়া, এবং ভালবাসার মর্ম্মকথা আমার সাধ্যমত বুঝাইতে গিয়া, আমি আর আত্মগোপন করিতে পারিতেছি না। আজ আপনারা

আমায় দেখিতেছেন আমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী; কিন্তু আমি ত চিরসন্ন্যাসী নয়। আমার গৃহ ছিল, সংসার ছিল; আর সংসারের সার যে ভালবাসার সামগ্রী তাহাতেও আমি বঞ্চিত ছিলাম না। ভালবাসার সামগ্রী ছিল বটে, কিন্তু ভালবাসায় আমি চিরবঞ্চিত। আজ সন্ন্যাসীর শুষ্ক চিত্তে অতীতের তরঙ্গ আবার বহিল কেন? তরঙ্গ ছুটিল ত ভূতকথা বিবৃত করিয়া আজ চিত্তের ভার লাঘব করিব। আমার ভালবাসার ইতিহাস আজ অকপটে আপনাদের সমক্ষে নিবেদন করিব।

আমি ভাল বাসিতাম—নবীন যৌবনে, দুর্দ্দান্ত হৃদয়ের দুরন্ত আবেগভরে আমি একদিন ভালবাসিতাম। প্রাণের যত পিপাসা, হৃদয়ের যত বৃত্তি, চিত্তের যত বন্ধন সকলই আমার সেই ভালবাসায় জড়ান ছিল। ইন্দ্রিয়গ্রাম আমার ভালবাসায় আচ্ছন্ন ছিল, আমার ভালবাসার বেগ তাহারা যেন সহ্য করিতে পারিত না। ভালবাসায় আমার চক্ষু অন্ধ, আমার কর্ণ বধির, আবার রসনা বিকল, আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় তেজোহীন, আমার চর্ম্ম অসাড়, আমার হস্তপদাদি অবশ, আমার চিত্ত অধীর হইয়াছিল। ভালবাসা ভিন্ন অন্য কথা আমি শুনিতাম না, অন্য সৌন্দর্য্যে দৃকপাৎ করিতাম না, অন্য স্বাদ, অন্য গন্ধ, অন্য স্পর্শ অনুভব করিতাম না, অন্য চিন্তার অবকাশ মনোমধ্যে আর থাকিত না। তাই বলি, আমার ইন্দ্রিয়সকল এক ভালবাসাতেই এক প্রকার ব্যতিব্যস্ত থাকিত, অন্য ব্যাপারে তাহারা একবারে যেন নিশ্চেষ্ট নিঃসামর্থ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু এমন করিয়া ভালবাসিয়াও, ভালবাসায় আমি কখনও সুখ পাই নাই। আমার ভালবাসা, শৈলতল-বাহিত অনন্ত-প্রধাবিত নদীতরঙ্গের ন্যায় পাষাণের পাদমূলে নিয়ত প্রতিঘাত করিত; পাষাণ সে তরঙ্গাঘাতে কখনও ভাঙ্গিল না ক্ষয়িল না, ডুবিল না টলিল না। পাষাণ ভাঙ্গিয়া, পাষাণ বুকে করিয়া আমি ত ভাসাইতে পারিলাম না। আমার ভালবাসা, তরঙ্গে তরঙ্গে পর্ব্বতপদপ্রান্তে মাথা কুটাকুটি করিয়া, আঁকিয়া বাঁকিয়া নৈরাশ্যের কাতরতায় অলক্ষ্যে ছুটিত; পাষাণ ভাঙ্গিয়া, পাষাণ গলাইয়া, সোজা পথে সরল হইয়া কখনও ললিত-লহরী খেলিতে পাইল না। আমার ভালবাসা, গহনজাত, পাদপাচ্ছন্ন কুসুমকলিকার ন্যায়, মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলকমলিনীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ ছড়াইয়া সচ্ছন্দে কখনও ফুটিতে পাইল না; রবিরশ্মিসম্প্রপাতে কখনও সে বনকুসুম প্রাণ ভরিয়া প্রাণের হাসি হাসিতে পাইল না। আমার ভালবাসা, বালবিধবার পতিপূজাভিলাষের ন্যায়, অন্তরে উদিত হইয়া অন্তরেই লয় পাইল; কত সাধের গাঁথামালা যমুনার জলে ভাসান গেল, দেবতার গলে দোলান হইল না। আমার ভালবাসা, অমাবস্যার নিশীথ নীল গগণে লক্ষ লক্ষ যোজনের ললিতোজ্জ্বল তারকারাশির ন্যায় অন্ধকারে মিটি মিটি ফুটিয়া, আঁধারে আঁধারেই আবার নিবিয়া গেল, আলোকের মুখ কখনও দেখিতে পাইল না। আমার ভালবাসা, মুমূর্ষু রোগীর দেহে (blister) তীব্র প্রলেপের ন্যায় যন্ত্রণায় জ্বালাইযাই চলিয়া গেল, আরোগ্যের শান্তি জন্য আর অপেক্ষা করিল না। দুঃখের

দাবদাহেই আমার ভালবাসার অবসান হইল, সুখের শীতলতা কখনও অনুভব করিতে পাইল না। কিন্তু এই অসহ্য অন্তর্দাহে দগ্ধ হইয়াও আমি মুখ ফুটিয়া সে কথা কখনও কাহাকে বলি নাই, যাহার জন্য এত যন্ত্রণা তাহাকেও ইঙ্গিতে জানাই নাই। কেন জানাই নাই, সে কথার উত্তর বঙ্গসাহিত্যে আছে :—

আমার মনোবেদনা কভু শুনাওনা তায়।
শুনিলে আমার দুখ, সে পাছে বেদনা পায়॥
না বাসে না বাসে ভাল, ভাল থাকে সেই ভাল,
শুনি তার মঙ্গল তবু ত প্রাণ জুড়ায়॥

কিন্তু সেই যে আমার যন্ত্রণা—সে যন্ত্রণাও ত অধিক দিন ভোগ করিতে পাইলাম না। সে যন্ত্রণা যতদিন ছিল, ততদিন আমি মানুষ ছিলাম, সংসারী ছিলাম; অসহ্য অনন্ত শিখা বুকের ভিতর বহন করিয়া অতিকষ্টে অন্ধকারসমুদ্র পার হইয়া আসিতেছিলাম। তাহার জন্য যে কষ্ট, সে কষ্টের ভিতরেও আমার যেন শান্তি ছিল; তাহার জন্য যে দুঃখ, সে দুঃখকেও আমি সুখ বলিয়া মনের সাধ মনেই মিটাইতাম; তজ্জন্য যে শোকাশ্রু, তাহা আনন্দাশ্রু বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে প্রমত্ত চিত্তকে প্রবোধ দিতে পারিতাম। জ্বরের উত্তাপ যতদিন ছিল, ততদিন বিকারের সহস্র উপসর্গ সত্ত্বেও তবু ত দেহে প্রাণ ছিল। কিন্তু যেদিন জ্বর ত্যাগ হইল, দেহযন্ত্রের কলবল যেদিন অচল হইল, উত্তাপ ঘুচিয়া যেদিন হিমাঙ্গ হইল, সেইদিন সব ফুরাইল, প্রাণপক্ষী পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া সেইদিন জনমের মত উড়িয়া গেল। সব ফুরাইল

বটে, প্রাণ বিয়োগ হইল বটে, কিন্তু কেমন যে রোগ তা জানি না, সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য ত গেল না। শক্তি গেল স্মৃতিলোপ ত হইল না। বিষয় গেল, বাসনার অবসান ত হইল না। রূপ গেল, দৃষ্টি ত অন্ধ হইল না। সরোবর শুকাইল, পিপাসা ত মিটিল না। কুসুম কীটে কাটিল, ঘ্রাণের তবু ত ব্যত্যয় হইল না। সঙ্গীত থামিল, শ্রবণ তবু ত বধির হইল না। তরণী ডুবিল, আরোহী তবু ত জলমগ্ন হইল না। আমি না মৃত না জীবিত, না জাগ্রত না সুষুপ্ত, না রুগ্ন না সুস্থ, না অচল না চঞ্চল, না সহজ না উন্মত্ত, না শান্ত না উত্তপ্ত, না মানুষ না ভূত, কিন্তূত-কিমাকার হইয়া, ইহ-পরকালের সম্বন্ধ ভুলিয়া, ইহ জগতের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া, সেইদিন হইতে বিকল বিহ্বলচিত্তে ব্যাকুল হইয়া অকূলে ভাসিতে লাগিলাম।

সেদিন কি ভয়ঙ্কর! ধীরে ধীরে আমার ভগ্নতরী লইয়া কালস্রোতে গা ভাসাইয়া আমি চলিয়া যাইতেছিলাম। দিক্ বিদিক্ আমার লক্ষ্য ছিল না, সুখসমীরণ আমার সহায় ছিল না, তরণী আমার বশে চলিতেছিল না। তথাপি আমি সুখে দুঃখে, দুঃখময় সুখে সন্তুষ্ট হইয়া, স্রোতো-বশে যে দিকে হউক—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম যখন যে-দিকে-হউক, কোন একদিকে অলক্ষ্যে ভাসিয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু অকস্মাৎ সে দিন, কি ভয়ঙ্কর প্রলয়বাত্যা সমুত্থিত হইল। হঠাৎ কোন্ দিক্ হইতে ঝড় বহিল দেখিতে পাইলাম না, কখন মেঘোদয় হইল, দেখি নাই; কতক্ষণ হইতে প্রলয়-রঙ্গের আয়োজন হইতেছিল জানিতে পারি নাই। হঠাৎ

দেখিলাম, প্রভঞ্জন শন্ শন্ রবে আকাশ অবনী আকুল করিয়া, জগৎ ব্রহ্মাণ্ড বিকম্পিত করিয়া, প্রচণ্ডবেগে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। ঘন ঘন বজ্রপাতের বিকট শব্দে দিগন্ত প্রতিশব্দিত হইতে লাগিল। জলধি পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ তুলিয়া, মহাদম্ভে, সেই সঙ্গে রণরঙ্গে মাতিয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া দেখি সাগরে আকাশে, আকাশে সাগরে যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। রাশি রাশি কালমেঘ আসিয়া ক্রমে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তব্যাপী অন্ধকারে অনন্ত শূন্য ভরিয়া গেল। মাঝে মাঝে ক্ষণপ্রভার পিঙ্গলালোকে সে অন্ধকারসমুদ্রে যেন ফেণিল তরঙ্গের নৃত্যলীলা অভিনীত হইতে লাগিল। আতঙ্কে আমি আর চক্ষু চাহিতে পারিলাম না। সভয়ে চক্ষু মুদিলাম। চক্ষু চাহিয়াও যে অন্ধকার, চক্ষু মুদিয়াও সেই অন্ধকার। ভুবন ব্যাপিয়া যেন অন্ধকারের রাজত্ব। অন্ধকাররাজ্যে প্রভঞ্জন দেব যেন মহাকালের প্রলয়ভেরী বাজাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণ্ডভেদী কোলাহলে আমার কর্ণ বধির হইয়া গেল। তরঙ্গতাড়নে আমার ক্ষুদ্রতরী মুহুর্মুহু নাচিতে কাঁপিতে লাগিল। তরণীর সঙ্গে সঙ্গে আমি কাঁপিলাম, বোধ হইল যেন বিশ্বচরাচর ঘোর ঘন কম্পনে নৃত্য করিতেছে। ক্রমে আমার চৈতন্য লোপ হইয়া আসিল। কোথায় কি হইল, কিসের পর কি হইল, আর দেখিতে পাইলাম না।

অচেতন হইয়া কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। চৈতন্যোদয়ে চাহিয়া দেখি, তরণী আর নাই। যতদূর দৃষ্টি চলে, চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, তরণীর চিহ্নমাত্র কোন

দিকে দেখিতে পাইলাম না। কোনদিকেই কেহ কোথাও নাই, কেবল অনন্তবিস্তারিত দুরন্ত বারিধি তরঙ্গ-ভঙ্গে ভ্রুকুটি করিয়া রণরঙ্গে নৃত্য করিতেছে। উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলাম, প্রলয়ের ঘনঘটা তেম্‌নি বিকটরবে ঘন ঘন গর্জ্জন করিতেছে। উপরে বজ্রবাহী জলধর, আর নিম্নে জলনিধি সমুদ্র, উভয়ে আড়াআড়ি করিয়া, উভয়ে গলাগলি করিয়া, সমানে গর্জ্জন করিতেছে। যেদিকে চাই, কেবল অনন্ত সাগর, আর অনন্ত শূন্য, অনন্ত নীলিমায় ধূ ধূ করিতেছে। সেই জলধি-জলধরের অপূর্ব্ব রঙ্গলীলা মধ্যে আমি একাকী পড়িয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিলাম। লোক নাই লোকালয় নাই; কূল নাই, দ্বীপ নাই; বৃক্ষ নাই, পর্ব্বত নাই; কেবল শূন্য আর সলিলরাশি। তরঙ্গতুফানে নাচিতে নাচিতে, তরঙ্গতুফানে ভাসিতে ভাসিতে, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানহারা হইয়া, কখন্ কোন্‌দিকে আমি চলিলাম তা বলিতে পারি না। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত, ক্ষণে ক্ষণে চেতনাযুক্ত হইয়া আমি চলিলাম। কতদিন, কতরাত্রি, এইভাবে আমার মাথার উপর দিয়া কাটিয়া গেল তা জানি না। দিবারাত্রির প্রভেদজ্ঞান আমার ত কিছুই ছিল না; দিনরাত্রি তখন আমার সমান বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

এইরূপে ভাসিতে ভাসিতে, এম্‌নি করিয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে, কতদিন পরে তা কে জানে, অবশেষে একদিন একটা উপকূলে গিয়া উঠিলাম। তখন আমার যে অবস্থা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তখন আমি জীবন্মৃত। সমুদ্রের তুফান, আকাশের তুফান তখন একটু থামিয়াছে

বটে, দিঙ্‌মণ্ডল তিমিরাবসানে তখন ঈষদালোকময় হই-য়াছে বটে। আলোকসাহায্যে দেখিলাম, যেখানে উঠি-য়াছি, সে এক অনন্ত বিস্তারিত নিবিড় গহন। অরণ্য আর লোকালয়, আমার পক্ষে তখন সব সমান,—সব একাকার। গহনের হিংস্রপ্রাণী আমায় দেখিয়া যেন বিদ্রূপভরে বিকট গর্জ্জন করিয়া চলিয়া গেল, ঘৃণা করিয়া আক্রমণ করিল না। কত কষ্টে গহন পার হইয়া দেখি সম্মুখে অনলময় বালুকাপূর্ণ ভীষণ মরুপ্রান্তর। প্রান্তর পারে দেখিলাম লোকালয় আছে বটে, কিন্তু সে জনপদ আমার পক্ষে অরণ্য বলিয়াই প্রতীত হইল। জনপদবাসী জীবগণ আমার সহিত কথা কহিতে আসিলে শ্বাপদজ্ঞানে আমি চমকিত হইলাম; আমার আচরণে বিরক্ত হইয়া তাহারা সরিয়া গেল। গৃহপ্রাসাদ সকল দ্বার-গবাক্ষরূপ মুখ বিকাশ করিয়া যেন আমায় গিলিতে আসিল। ক্ষিপ্ত শৃগালের ন্যায়, যমদূততাড়িত প্রেতমূর্ত্তির ন্যায় অস্থির হইয়া আমি গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া আবার পথে পথে ফিরিতে লাগিলাম। একটা ভবনে একবার প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তথায় উৎসবের বড় ধূম লাগিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই! এ কিসের উৎসব?" ভ্রূকুটি করিয়া সে উত্তর দিল, "পাষণ্ড! তুমি এমন পাগল যে দুর্গোৎসব দেখিয়াও বুঝিতে পারিতেছ না,—তোমার মাথা মুণ্ড কি হইতেছে? মহাষ্টমীর দিনেও তোমার মাথা ঠিক হইল না?" আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া আবার একজনকে প্রশ্ন করিলাম, "ভাই! একি

শ্মশানকালী! নহিলে পিশাচের নৃত্যসহিত হিঃ হিঃ রব শ্মশান ভরিয়া উঠিয়াছে কেন?” সন্ধিক্ষণে যে বলিদান করিয়াছিল, তাহার হাতে সেই রুধিরস্রাবী খড়্গ তখনও ছুলিতেছিল। কথাটা তার কাণে গেল। সে সেই খড়্গা লইয়া আমায় তাড়া করিল। আমি একলম্ফে দ্বারলঙ্ঘন পূর্ব্বক বাড়ী ছাড়িয়া পথে গিয়া পড়িলাম। পথে দেখি, লোকে লোকারণ্য। দলে দলে, কাতারে কাতারে, লোক সকল, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রাচীনে মিলিয়া আরতি দেখিবার জন্য ছুটিয়াছে। আরতির বাজনা আমার কাণে বাজিল। বোধ হইল যেন গঙ্গা-যাত্রার সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। আমি “গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম” বলিয়া একদিক্ দিয়া উধ ও ছুটিতে লাগিলাম।

তদবধি, আমি ছুটিয়া ছুটিয়া পথে পথেই ফিরিতে লাগিলাম। কখন্ কোথায় যাই, কখন্ কোথায় খাই, কিছুরই স্থিরতা থাকে না। অতিথি দেখিয়া কেহ দয়া করিলে, বা পাগল বলিয়া বালকে উপহাস করিলে সুখ দুঃখের অধীন হইতাম না। সন্ন্যাসী হইয়া সংসারের রঙ্গ দেখিতে লাগিলাম। উৎসবের পর উৎসব, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, সচ্ছন্দে আমার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল, কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। বর্ষা শরৎ, শীত বসন্ত, একে একে কাটিয়া গেল, ফলাফল আমার কাছে সকলই সমান। বর্ষায় ময়ূর নাচিল, নদী মাতিল, কৃসক হাসিল, ধরণী ভাসিল। আমি ত ভাসিয়াই আছি, আমার পক্ষে আর নূতন কি? শরতে কুসুম ফুটিল,

যামিনী জ্বলিল, ধরণী শস্যভূষণে মরকতের মালা দোলাইলেন, আকাশ মেঘদল বিদূরিত করিয়া নীল কান্তি প্রকটিত করিলেন। আমার হৃদয়াকাশের ঘনজাল ত বিদূরিত হইবার নহে। হেমন্তে পদ্মিনী মলিনা, তটিনী যৌবনহীনা হইয়াও তথাপি আপনার সৌন্দর্য্য সমূলে ত্যাগ করিলেন না। শীতের তাড়নে ধরণী কম্পিতা হইয়াও উৎসবের উল্লাস পরিহার করিলেন না। আর শীতাবসানে ঋতুরাজ কলকণ্ঠে পঞ্চমের তান ছাড়িয়া জগতের শিরায় শিরায় মধু সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। আমার শিরায় শিরায় কিন্তু হলাহলের ধারা তেম্নি প্রবল প্রবাহে ছুটিতে লাগিল।

উৎসবের পর উৎসব আসিল, চলিয়া গেল; আমার হৃদয়ের নিরুৎসব কিছুতেই ত ঘুচিল না। দুর্গোৎসবের পর লক্ষ্মীপূজা আসিল। কোজাগর পূর্ণিমার পূর্ণালোকে আমি ডাকিলাম, "এস, এস মা লক্ষ্মি! জন্মের শোধ বুঝি মায়া কাটাইয়া চিরবিদায় লইতে আসিয়াছ, এস তোমায় প্রণাম করি। ধরণী শ্রীহীনা হইয়াছে, আমিও এইবার লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছি, তবে আর কেন কমলা! মায়া বাড়াইয়া কাজ কি? এস তোমায় জনমের মত প্রণাম করি।" কমলার পর কালী আসিলেন। অমাবস্থার অর্দ্ধরাত্রে, মহানিশার মাহেন্দ্রক্ষণে করালবদনা মহাকালী। ভাবিলাম আমার উপযুক্ত ইষ্টদেবতা বটে। এতক্ষণ কোথা ছিলে মা! এতকালের পর, যাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছিলাম, সেই—

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥

দ্বীপিচর্ম্ম পরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতি বিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিত দিঙ্‌মুখা॥

এস মা! এ দুর্দ্দিনে ডাকিতে হয় ত তোমাকেই ডাকি। এস মা! এলোকেশে রণবেশে, আমার হৃদয়সংগ্রামে এসে যোগ দাও। আমি যোড়করে ডাকি,—

করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।

রাশি রাশি কালমেঘে আমার হৃদয় ঘেরা, আমি মহা-মেঘবরণাকে ডাকি,—

মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং।

সংসারসমরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে রুধির-ধারা বহিতেছে, আমি রুধিররঙ্গিণীকে ডাকি,—

কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীং গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাং।

রুধিরপানচিহ্নে যাঁহার বদনকমল চিহ্নিত, সেই শোণিত-শোষিণীকে ডাকি,—

সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারা বিস্ফুরিতাননাং।

জগৎ শ্মশান হইয়াছে, আর আমার হৃদয়শ্মশানেও চির-চিতানল জ্বলিয়াছে। অতএব এ শ্মশানরাজ্যে সেই শ্মশান-বাসিনীকেই ডাকি,—

ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং।

এস মা শ্মশানরঙ্গিণী! ভূতপ্রেতসঙ্গিণি! সংহারক-হৃদিবাসিনি! প্রলয়ের যা কিছু বাকী আছে, এইবার ক্ষিপ্র-হস্তে তুমি সারিয়া লও মা। তোমায় দেখিতেছি—

সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গ বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজাং।

বামদিকের এক হাতে কৃপাণ, আর এক হাতে শুম্ভাসুরের ছিন্নমুণ্ড। তবে আর কেন? ঐ কৃপাণমণ্ডিত বাম হস্তখানি এই কয়টা মাথার উপর একবার ঘুরাইয়া লও, আর কয়েকটা নরমুণ্ড তোমার ঐ মুণ্ডমালায় যোজিত হউক। তোমার শোভা বাড়িবে, তোমার ভূষণ ভাতিবে, তোমার ভক্ত ভজিবে—

দক্ষিণাং কালিকাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং।

সর্ব্বনাশিনি! জগতের সৌন্দর্য্য ধ্বংস করিয়াছ, অসার জগৎ রাখিয়া আর ফল কি? কপালের মাঝে তিন তিনটা চক্ষু! নয়ন মেলিয়া কি দেখ না মা? তোমার ত্রিনয়নের পায়ে প্রণাম—

বালার্কমণ্ডলাকার লোচনত্রিতয়ান্বিতাং।

শ্যামারূপে জগৎ ধ্বংস করিয়া আবার এ কি মূর্ত্তিতে দেখা দিলে মা! জগদ্ধাত্রী! জগৎ রসাতলে দিয়া আবার জগতে রাজত্ব করিতে আসিয়াছ! এই যে তোমায় দেখিতেছি—

সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং।

কেশরীর স্কন্ধে ভর করিয়া, সাপের পৈতা গলায় জড়াইয়া, এখানে কেন মা! তোমায় কে ডাকিল?

নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবগেহিনীং।

যাও মা ভবের ঘরণী! গৃহে যাও। নারদাদি দেবর্ষিরা তথায় তোমার পূজা করিবেন।

জগদ্ধাত্রীর পর আবার এ কে? নবকার্ত্তিক! দেবসেনাপতি! রণবেশ ছাড়িয়া, ফুটফুটে বাবুর বেশে,

বাবুর দেশে বিলাসভোগ খাইতে আসিয়াছ। বেশ বেশ! ঢোলক তবলার খাসা বোলে বাঙ্গালী তোমায় খুসী করিয়া দিবে।

তাহার পর, কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়, কালাচাঁদ আসিলেন রাসবিলাসে। মরুভূমে মদনকুঞ্জ সাজাইয়া, রসময়ের রাস-লীলা! ছি ছি ব্রজরাজ আর জ্বালাইও না। তোমার বৃন্দা-বন ভাঙ্গিয়াছে, তোমার কমলা বিদায় লইয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিয়াছেন, তোমার ও বংশীরব আর কে শুনে বল? অতএব বংশীধর! তুমি ক্ষান্ত হও—

আর বাঁশী বাজাওনা শ্যাম!

এখানে আব তোমার রাসে কাজ নাই, দোলেও কাজ নাই। তুমি যে বল,—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

তোমার ভক্তবৃন্দ কোথায় তোমাব নাম গায়, তুমি গিয়া খুঁজিয়া দেখ। এখানে কেন ঠাকুর! আমরা কেবল গোলে হরিবোল করি বৈ ত নয়।

উৎসব সব গেল, শেষ রহিল কেবল বসন্তের শ্রীপঞ্চমী। বাসন্তী পঞ্চমীর দিনে বীণাপাণির কি বিড়ম্বনা! সেই দিন আমি মনে মনে ভাবিলাম, মা ভারতি! আর কেন? কি সোহাগে আর এখানে আসিয়াছ? তোমার বেদ-বিদ্যা, তোমার সঙ্গীত-কলা সকলই ত আমরা ভাসাইয়া দিয়াছি। তোমার সহিত আর সম্পর্ক কি মা! তোমার বেদের শ্রাদ্ধ হইতেছে জার্ম্মাণী ও ইংলণ্ডে; আর তোমার সঙ্গীতের

শ্রাদ্ধ হইতেছে থিয়েটারে ও বারাঙ্গনার বিলাসকুঞ্জে। কেন তবে দেবি! এ শুষ্ক সরোবরের ছিন্ন কমলে ভর করিয়া বসিতে আসিলে ভারতি!

উৎসবের উল্লাসে আমায় উৎসাহিত করিতে পারিল না, পৃথিবীর কোলাহলে আমার বিকলচিত্ত বশীভূত হইল না। অন্যমনে, উদ্ভ্রান্ত প্রাণে, আমি দেশে দেশে ঘুরিতে লাগিলাম। কত তীর্থ পর্য্যটন করিলাম; কত নদ নদী, কত ভূধর প্রান্তর, কত কানন তপোবন, কত নগর জনপদ পরিভ্রমণ করিলাম, কোথাও শান্তির সাক্ষাৎ পাইলাম না। যাহা হারাইয়াছি, তাহার বিনিময়ে ভূমণ্ডলময় অন্বেষণ করিলাম; সে রত্ন, সে সৌন্দর্য্য, সে কান্তি, সে শোভা, সে দীপ্তি, সে মাধুরী, সে সুখ, সে তৃপ্তি জগতের আর কোন চিত্রেই দেখিতে পাইলাম না। জগতের কত চিত্র দেখিলাম, কত কাব্য পড়িলাম, সকলই রঙ্গহীন রসহীন বলিয়া প্রতিভাত হইল। জগৎ যেন অযত্ন-রক্ষিত উদ্যানের ন্যায়, প্রতিমাশূন্য চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় অনাদরে পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিতে দুঃখ হয়; দেখিলে তৃপ্তি হয় না। মাথায় হাত দিয়া, বিরলে বসিয়া বসিয়া কত ভাবিলাম! হায় হায়! জগতের সৌন্দর্য্য কে চুরী করিল রে? প্রকৃতির প্রাণ কে হরণ করিল রে? সৃষ্টির মোহিনীশক্তি কে তুলিয়া লইল রে? সুষমার সারটুকু কে কাড়িয়া লইল রে? আমার মনে হইতে লাগিল, জগতের সেই সব আছে, কিন্তু একটা কি যেন নাই। চন্দ্রকিরণে সেই মাধুরী আছে, সুধা যেন নাই। প্রফুল্ল কুসুমে সৌরভ আছে, মধু যেন নাই। কোকিলের কলকণ্ঠে পঞ্চ-

মের ভান আছে, কিন্তু সেই কমনীয়তা যেন নাই। তটি-নীর কলনাদে আবেশ আছে, কিন্তু উল্লাস যেন নাই। নির্ঝরের ঝর্ঝর গীতে তানের কর্ত্তপ আছে, লয়ের সামঞ্জস্য যেন নাই। সঙ্গীতের সুধাধ্বনি গগণ ভেদিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু স্বরের সহকারিতা তাহাতে যেন নাই। মনে মনে তর্ক করিলাম, মনে মনে সন্দেহ করিলাম, বিশ্ববিধাতার বিশ্ব-নির্ম্মাণ কৌশলে ধিক্। তাঁহার এ বিশ্বনাট্যশালার একটা উপকরণ অপহৃত হইল, সমগ্র সৃষ্টি অমনি অঙ্গহীন বলিয়া বোধ হয় কেন? এ বিশাল বিশ্বযন্ত্রের একটা তন্ত্রী ছিঁড়িল ত অমনি অবশিষ্ট তারগুলা সকলেই বেসুরা বলে কেন? তর্কের পর তর্ক উঠিল; আমার চিত্তচূড়ামণি এইখানে থমকিয়া দাঁড়াইলেন; কথা পড়িল যে, তন্ত্রী ছিঁড়িল কার! বিশ্বযন্ত্রের, না আমার হৃদয়যন্ত্রের? বেসুরা কে বলিতেছে, আমি না বিশ্ব? ভূল কার, আমার, না বিশ্বরচয়িতার? এইবার বড় বিষম গোলে পড়িলাম। হরি হরি! ভুল কার? আমার, না ভালবাসার? সৌন্দর্য্য কার চুরী গিয়াছে? ভালবাসায় কার আঘাত পড়িয়াছে? আমার,—না জগতের? শ্রীহীন কে হইয়াছে, জগৎ,—না আমি? শ্রীহীনে আমার এত হীনতা হইয়াছে? ভালবাসায় আমাকে এমন বিহ্বল করিয়াছে? ভালবাসার এত তেজ, ভালবাসায় এত ভুল, ভালবাসার এত ভোগ! ভালবাসা কি তবে আমার শত্রু? হয় হউক, শত্রু লইয়াই আমি ঘর করিব।

কিন্তু যাকে ভালবাসিতাম, যাকে ভালবাসি, যার ভাল-বাসা এ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না, সে এখন

কোথায়? এ শূন্য ভালবাসা লইয়া, নিরবলম্বনে আর কতদিন বাঁচিব? তবে কি ভালবাসা একবারে ত্যাগ করিতে হইবে? ভালবাসার বৃত্তিটা হৃৎপিণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তবে কি তুলিয়া ফেলিব? হৃদয়ের স্তরে স্তরে, হৃদয়ের অণুতে অণুতে, যে ভালবাসা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহার বিচ্ছেদ কি সম্ভবে? তাহার মূল ধরিয়া টানিলে হৃৎপিণ্ড আপনি উপাড়িয়া আসিবে। শরীরের অস্থিমজ্জায়, পঞ্চ-ভূতের প্রাণে প্রাণে, প্রাণের পরতে পরতে যে ভালবাসা মিশাইয়া গিয়াছে, তাহাও কি আবার বিসর্জ্জন করা যায়? ভালবাসা লইয়া তবে কি পাগল হইতে হইবে? যাহাকে ভালবাসিব, সে যখন নাই, এ ভালবাসার ভার তবে কোথায় ন্যস্ত করি? নিশীথ-নীরবে, ক্ষুদ্র এক তটিনীর তটে বসিয়া, নির্জ্জনে এই দুশ্চিন্তায় একদা আকুল হইয়া পড়িয়াছি। এমন সময়, পরপার হইতে সমাগত একটা প্রণয়-গীতির ধ্বনি আমার কাণে বাজিল। কাণ পাতিয়া সে সঙ্গীত শুনি-লাম। সে সঙ্গীত পুরাতন, কতবার তাহা শুনিয়াছি; কিন্তু আজ সেই পুরাতন গীতি নূতন হইয়া আমার হৃদয়ের মর্ম্ম স্পর্শ করিল, আমার হৃদয়ের চক্ষু ফুটাইয়া দিল। গায়ক পুনঃ পুনঃ পাল্টাইয়া গানটা গাইল। একাগ্রমনে আমি পুনঃ পুনঃ শুনিলাম—

যাবৎ জীবন রবে কারে ভাল বাসিব না।
ভালবেসে এই হলো, ভালবাসার কি লাঞ্ছনা॥
আমি ভাল বাসি যারে, সে কভু ভাবে না মোরে,
তবু কেন তারই তরে নিয়ত পাই এ যন্ত্রণা।

ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারে ভাল বাসে না ॥

গান শুনিয়া আমি বুঝিলাম, ঠিক কথা। ভালবাসা লইয়া আর পণ্ডশ্রম করিলে চলিবে না। যাহাকে ভালবাসিতাম সে যখন ছিল, তখন আমার ভাবনা ত একদিনও সে ভাবে নাই। নাই ভাবুক; কিন্তু এখন তাহার সন্ধান করিয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলেও ত আর কোন ফল নাই। যে গিয়াছে সে ত আর ফিরিবে না। যাহা ভাঙ্গিয়াছে তাহা ত আর গোটা হইবে না। যাহা হারাইয়াছে, তাহা ত আর উদ্ধার হইবে না। মহাকাল যে রত্ন গ্রাস করে, তাহা ত আর উগারিয়া দেয় না। অতএব তাহার প্রতি যে ভালবাসা, সে ভালবাসা এখন ভুলিয়া যাওয়াই ভাল। ব্যক্তিগত ভালবাসা লইয়া আর বৃথা কর্ম্মভোগ করা কেন? ভালবাসা কিছু একবারে ত্যাগ করিতে পারিব না। তবে এ ভালবাসার ভার কোথায় লইয়া ফেলি? তাহার পথ আছে। যে ভালবাসার ভার একজনের স্কন্ধে চাপাইয়াছিলাম, সেই ভালবাসা এখন ভাগ করিয়া ফেলা যাক্। ভালবাসাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, শত সহস্র, কোটি কোটি, অনন্ত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থে বিন্যস্ত করা যাক্। চেতনে অচেতনে, জড়ে উদ্ভিদে, নিখিল চরাচরে ভালবাসা বিলাইতে অভ্যাস করি। আমার ভালবাসার ভাগী একজনকে আর করিব না, সাত রাজার ধন কোন্ বঞ্চকে চুরী করিয়া, আমায় ফকির করিয়া পলাইবে; সে পথে আর যাওয়া হইবে না। তবে এস ভাই! নর বানর, পশু পক্ষী,

কীট পতঙ্গ, মীন সরীসৃপ, স্থল জল, অন্তরীক্ষের যত প্রাণি-বৃন্দ, একে একে আসিয়া আমার ভালবাসার ভাগ গ্রহণ কর। এস বৃক্ষ লতা, ফল কুসুম, শিলা মৃত্তিকা, সলিল বায়ু, অনল আকাশ, যে যথায় আছ, আমার ভালবাসার অংশ লইয়া আমার ভার লাঘব কর। সুন্দর অসুন্দর, নবীন প্রবীণ, পুণ্যাত্মা পাপী, কাহাকেও আমি বঞ্চিত করিব না; সবাই আসিয়া আমার ভালবাসায় ভাগ বসাও।

এখন জাগতিক পদার্থমাত্রে, এইরূপে ভালবাসা বিলাইয়া ব্যক্তিগত ভালবাসার দায় হইতে আমি অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতেছি। এই অভ্যাসের নামই যোগসাধন। এ সাধনায় আমি সিদ্ধ হইয়াছি এমন কথা অবশ্য বলিতে পারি না। সিদ্ধি ভগবানের প্রসাদসাপেক্ষ। তবে এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, এই সাধনায় আমি অনেকটা তৃপ্তি-লাভ করিয়াছি, আমার মনের ভার অনেকটা লাঘব হই-য়াছে। এ সাধনায় আর একটা সুখ আছে, আর একটা মহদুপকার আছে। জগৎকে এইরূপে ভাল বাসিতে অভ্যাস করিলে জগৎপতির পদলাভ অনেকটা আয়ত্ত হইয়া আসে। জগতের সহিত জগদীশ্বরের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। জগতের প্রত্যেক পদার্থেই অব্যক্তভাবে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি নিজমুখেই বলিয়াছেন—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।

তিনি জগতে, আবার জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত রহিয়াছে।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥

অধিক কি, জগতে তিনি ছাড়া ত আর কিছুই নাই; সূত্রগ্রন্থিত মণিসমূহের ন্যায়, সমগ্র জগৎ তাঁহার চরণে বাঁধা আছে।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

অতএব এই জগৎকে ভালবাসিতে যে শিখিবে, তার ভালবাসা জগদীশ্বরের চরণে অবশ্যই পহুঁছিতে পারে। যদি তাই হয়, তবে আমার এ ভালবাসাকে আমি ধন্য বলিয়া মানি। যে ভালবাসা, মর্ত্ত্যপ্রাণীকে লইয়া প্রেমময়ের চরণে উপনীত করিতে পারে; যে ভালবাসা, পৃথিবীর কলুষতাপ হইতে পৃথিবীপতির প্রসাদ-চ্ছায়ায় জীবকে সমাশ্রিত করিয়া দেয়; যে ভালবাসা, জগতের কামনা-জঞ্জাল, জগতের বিরহ-বিকার, জগতের বিদ্বেষ-বিলাস, জগতের মায়া-মোহ, জগতের দুঃখ-সন্তাপ হইতে চিরপরমানন্দের পথ জীবকে দেখাইয়া দিতে পারে; তাহারই নাম সার্থক ভালবাসা, বৈকুণ্ঠের ভালবাসা তাহাকেই ত বলিতে পারি। আমি ক্ষুদ্র হইয়াও সেই সাধুজন-বাঞ্ছিত ভালবাসার পথে পদার্পণ করিয়াছি। ইহাই আমার ব্রত, ইহাই আমার ভালবাসার ইতিহাস, ইহাই আমার সন্ন্যাস। ভালবাসায় আমায় সন্ন্যাসী করিয়াছে; এখন সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, সন্ন্যাসেই আমার ভালবাসার সাধ যেন পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী বক্তৃতা শেষ করিয়া আসন গ্রহণ করিলে, সভাস্থল কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। শ্রোতৃবর্গ বক্তার কথায় বিস্মিত বিচলিত হইয়া করতালি দিতে ভুলিয়া গেলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, বক্তৃতার জন্য আর কেহই প্রস্তুত নহেন দেখিয়া, সভাপতির শেষ কথা বলিবার জন্য আমি উত্থিত হইলাম। বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। তবে সভাপতি হইয়া শেষটা দুকথা বলিয়া না দিলে নিতান্তই নাকি মান থাকে না, তাই অগত্যা সেই অবেলায় আমাকে আবার আসর লইতে হইল। আমি উঠিয়া বলিলাম,—

সভ্যগণ!—দিবা প্রায় অবসান হইয়া আসিল। এখন দুঃখের বিষয় এই যে, এই অপরাহ্ণকালে, আমার বক্তৃতানলে আপনাদিগকে আবার জ্বালাতন হইতে হইবে। যে সকল বক্তৃতা আপনারা শুনিয়াছেন, সে সকলের রীতিমত সমালোচন করিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি আমার নাই। তবে বক্তৃতাগুলির সারসংগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদিগকে একবার শুনাইয়া দিলে বোধ হয় আপনারা আমায় অভিসম্পাত করিবেন না। কেবল সন্ন্যাসীর বক্তৃতা সম্বন্ধেই একটু বিশিষ্ট আলোচনার প্রয়োজন। অতএব সেজন্য অগ্রেই আপনাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রাখা ভাল। প্রথম বক্তা ব্রজরাজ

ভালবাসার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, স্ত্রৈণ-পুরুষ ও বিলাসিনী কুলকামিনীগণের অপযশ ঘোষণা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। বাস্তবিক আধুনিক শিক্ষার দোষেই হউক, আর যে কারণেই হউক, হিন্দু-সমাজে বিলাসের ব্যভিচার বড় বাড়িয়াছে, ভালবাসার স্রোত বিপথে বহিয়াছে; ভালবাসায় ধর্ম্মের ভাগ হ্রাস হইতেছে,—কামুকতার ভাগ, আত্মপরতার ভাগ সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। ভালবাসা স্নেহ ভক্তির স্থান অধিকার করিতেছে, ভালবাসা সমাজের বিঘ্নাচরণ করিতেছে, ভালবাসা ধর্ম্মকর্ম্মের সহায় না হইয়া পরকালের পথে কণ্টকরোপণ করিতে বসিয়াছে। আমাদের সহধর্ম্মিণীকে আমরা এখন বিলাসের সহকারিণী করিয়া তুলিয়াছি। বন্ধু ব্রজরাজ, রহস্যের ভাষায় এই সকল উপদেশ দিয়া, উপসংহারে জ্ঞানমার্গ ও মোক্ষধর্ম্মের কথা ইঙ্গিতে উল্লেখ করিয়াছেন। সে বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে হইলে, একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। প্রথম বক্তা তাহা করেন নাই, এবং আমিও এস্থলে তাহার আলোচনা করিব না। কেন-না, আমার কথার শেষভাগে, তৎসম্বন্ধে যথাসাধ্য বিচার করা আবশ্যক হইবে।

দ্বিতীয় বক্তা নবকুমার যে সমাজের ভালবাসা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, আমাদের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। হিন্দুসমাজ যাহার কোন সম্পর্ক রাখে না, হিন্দুসমাজের যাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, সে বিষয়ে আমাদের মাথা ঘামাইয়া কাজ কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন, নবকুমারের বক্তৃতা আমাদের না শুনিলেও চলিত। কিন্তু

আমি বলি, যাত্রায় সং না থাকিলে যাত্রার পালা অসম্পূর্ণ হয় না বটে, তথাপি কিন্তু সঙের প্রয়োজনীয়তা অনেকে স্বীকার করেন। অন্ততঃ নিতান্ত কুরুচির পোষক না হইলে সঙে অরুচি বড় কাহারও দেখা যায় না। অবসর বুঝিয়া সঙ সাজাইতে পারিলে, সঙে উপকারও যথেষ্ট হয়। এস্থলে নবকুমার নিজেই সঙ, বা সঙ সাজিয়া আসিয়াছেন, সে কথার বিচারে আমাদের কাজ নাই। বক্তৃতা লইয়াই আমাদের কথা; বক্তা লইয়া ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন কি?

তৃতীয় বক্তা, ডাক্তার মহাশয়। চিকিৎসকের চক্ষে ইনি ভালবাসার সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাঁর মতে, ভালবাসা এক বিষম ব্যাধি, উহার ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই। ভালবাসায় জগতের বড় অনিষ্ট হইতেছে। অতএব ভালবাসার চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার করিতে হইবে, অথবা ভালবাসা সৃষ্টিসংসার হইতে একবারে নির্ম্মূল করিতে পারিলেই ভাল হয়। ডাক্তার মহাশয়ের কথায় অনেকের ধোঁকা হইতে পারে। তাঁহার ভাষাটা কিছু দোভাষা রকমের। ব্যঙ্গোক্তির সঙ্গে মর্ম্মকথা এম্‌নি মিশান আছে যে, স্থলে স্থলে সে দুয়ের তারতম্য করা যায় না। ডাক্তার বাবু ভালবাসার শক্র, কি ভালবাসার মিত্রপক্ষ, সহজে তাহা অনুমান করা যায় না। সে অনুমানে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই; আর আমার নীরোগ শরীর, ডাক্তার বাবুকেও এখন আমার কোন প্রয়োজন নাই। এখন প্রয়োজন তাঁহার বক্তৃতা লইয়া। ডাক্তার মহাশয় স্বয়ং ভালবাসার শক্র হউন বা না হউন, এজগতে ভালবাসার

শত্রু বাস্তবিক কেহ আছে কি না, তাহা দেখা উচিত। আমার মতে, ভালবাসার শত্রু যদি কেহ থাকে, তবে তাহাদের সংখ্যা অতি সামান্য, এবং তাহারা হয় বাতুল, নয় ভণ্ড। ভালবাসায় মন্দের ভাগ আছে বলিয়া, ভালবাসার অপব্যবহারে, ভালবাসার ব্যভিচারে ভালবাসাকে লোকে মন্দ করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া, যে ভালবাসার শত্রুতাচরণ করিতে চায়, তাহাকে বাতুল ভিন্ন আর কি বলিব? মধু অধিক পরিমাণে খাইলে বুক জ্বালা করে বলিয়া কি মধুকে অপদার্থ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে হইবে? যে অন্ন জীবের প্রাণধারণের উপাদান, অতিরিক্ত ভোজন করিলে, অসময়ে বা অনুচিতকালে ভোজন করিলে, তাহাই আবার রোগের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাই বলিয়া কি অন্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে? ভালবাসার শত্রু বলিয়া যাহারা ভাণ করে তাহারা বুঝে না যে, ভালবাসা বিলুপ্ত হইলে জগতের অস্তিত্বই সম্ভবে না। ভালবাসা না থাকিলে সংসার থাকে না, সমাজ থাকে না, মনুষ্যত্ব থাকে না, জীবের জীবত্ব থাকে না; ভালবাসা না থাকিলে জীবের জন্ম হয় না, সন্তানের পালন হয় না, সংসারের ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না। এই যে মানবদেহ, এই যে পঞ্চভূতে মিশামিশি, এই যে জড়ের গঠন, এই যে উদ্ভিদরাজ্য, এই যে জীবসমষ্টি, এই যে অচেতন সৃষ্টি, ভালবাসা না থাকিলে, অণুতে অণুতে আনুগত্য না থাকিলে, এ সকলের অস্তিত্ব কোথায় থাকিবে? সৃষ্টির এ আকার কিসের উপর তিষ্ঠিবে? ভালবাসাই জগতের মূলগ্রন্থি, ভালবাসাই প্রকৃতি, ভালবাসাই ভগবানের সৃষ্টি-

কামনাসম্ভূত অপূর্ব্বশক্তি। এই ভালবাসা ধ্বংস করিয়া সৃষ্টি রাখিবার কল্পনা যে করে, সে ঘোর মূর্খ, ঘোর ভণ্ড, ঘোর নাস্তিক। এই শ্রেণীর বর্ব্বরগণকে বিদ্রূপ করাই বোধ হয় ডাক্তার মহাশয়ের উদ্দেশ্য। তাঁহার ব্যঙ্গোক্তির আবরণমধ্যেও ভালবাসার চিত্র যেরূপ উজ্জলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, রহস্যের আবরণ ভেদ করিয়া সে চিত্র যেরূপ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, তাহাতে ভালবাসাকে তিনি যে একটা অসার সামগ্রী বলিয়া, তুচ্ছ পদার্থ বলিয়া হেয় জ্ঞান করেন, ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে কখনই তাহা বোধ হয় না। ভালবাসা ব্যাধি নয়, ভালবাসাই জগতের সঞ্জীবনী সুধা। অমৃতে যার গরলভ্রান্তি, অমৃতে যার গরল উঠে, তার অদৃষ্ট বড় মন্দ।

চতুর্থ বক্তা, শিশিরকুমার। নিঃস্বার্থ ভালবাসার ভাব জগতে বড় বিরল, ইহাই ইহাঁর বক্তৃতার সার কথা। যে কেহ ভালবাসে, ভালবাসা যত রকমের আছে, সকলেরই গোড়ায় একটা না একটা স্বার্থসাধনের অনুরোধ আছে। যতক্ষণ স্বার্থের আশা, ততক্ষণই ভালবাসার অস্তিত্ব। স্বার্থের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হইলেই ভালবাসারও অস্তিত্ব লোপ হয়, স্বার্থ সিদ্ধ হইলে স্থলবিশেষে ভালবাসা শত্রুতায় পরিণত হয়। এই সকল তত্ত্ব কতক কতক দৃষ্টান্ত দিয়াও শিশিরকুমার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শিশিরকে লইয়াও অনেকের বুদ্ধিভ্রম হইতে পারে। অনেকেই মনে করিতে পারেন, শিশির বুঝি নিজে নিঃস্বার্থ ভালবাসার বিরোধী। আমি আবার বলি, শিশিরকে লইয়া টানাটানি করিবার প্রয়োজন

কিছুমাত্র নাই। তিনি নিজে যে কোন ভালবাসার চর্চ্চা করুন না কেন, যে ক্ষেত্রেই বিচরণ করুন না কেন, তাঁহার কথা লইয়াই আমাদের কাজ, তাঁহার চরিত্র লইয়া, তাঁহার গোপনীয় বিশ্বাস লইয়া আমাদের ফল কি? নিঃস্বার্থ ভালবাসাই যে শ্রেষ্ঠ ভালবাসা, নিস্বার্থ ভালবাসাই যে প্রকৃত ভালবাসা পদের বাচ্য, তাহা শিশিরের বক্তৃতাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। বক্তা যে ভাবে জনকনন্দিনী সীতা ও সুমিত্রাসুত লক্ষ্মণের ভালবাসা চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারাই যে জগতে নিঃস্বার্থ ভালবাসার চরম নিদর্শন, এ কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ব্যঙ্গচ্ছলে সীতা সৌমিত্রির দোষঘোষণা—ব্যাজস্তুতি অর্থাৎ নিন্দাচ্ছলে গুণ-কীর্ত্তন বলিয়াই বোধ হয়। যদি তা না হয়, যদি বক্তা ব্যঙ্গ না করিয়া, সত্য সত্যই সীতা-সৌমিত্রির ভালবাসার বিরোধী হন, তবে তিনি নিজেই বিদ্রূপের পাত্র; তাঁহার মর্ম্মকথা প্রকাশ করিতে গিয়া, প্রকারান্তরে, তাঁহার দ্বারা সত্যের সম্মানই সংরক্ষিত হইয়াছে।

পঞ্চমে আসর লইয়াছেন শর্ম্মা রসিকরঞ্জন। রসিক-ভায়া আসর লইয়া আসর মাৎ করিয়াছেন বটে। রসিকের সহিত কাহারই বিরোধ নাই, বিরোধ হইতেই পারে না। ভালবাসায় তাঁহার গাঢ় অনুরাগ। ভালবাসার ভাল ভাগটা, তিনি যত ভাল কথায় পারিয়াছেন, সাধ্যমত তুলনায় বর্ণনা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু, ভালবাসায় যে বিভীষিকা আছে, তাহা হইতে সমাজকে সাবধান করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে সঙ্কেতে বলিয়া দিয়াছেন, ভাই!

কুসুমে কীট আছে, উদ্যানে কণ্টক আছে, শশাঙ্কে কলঙ্ক আছে, মোদকে অম্বলের সম্ভাবনা আছে, অমৃতেও গরলের আশঙ্কা আছে। অতএব সাবধানে থাকিও, সাবধানে চলিও। শাস্ত্রেও বলিয়াছে—

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥

ভালবাসার গুণবর্ণনায় রসিকের কোন ত্রুটি নাই। সকল উপমা শেষ করিয়া, তিনি অবশেষে, আপনার মাথার মণি যে গৃহিণী, তাঁহাকে লইয়াও টানাটানি করিতে ছাড়েন নাই। গৃহিণীর প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া রসিকরঞ্জন মাঝখানটায় একটু গ্রাম্যতাদোষে বক্তৃতাটি কলঙ্কিত করিয়া অবশেষে মধুররসেই সমাপন করিয়াছেন বটে। রসিকের সেই দোষটুকু, চাঁদের সেই কলঙ্কটুকু, তুমি আমি সহ্য করিলেও, সকলে ক্ষমা করিবেন কি না তা জানি না।

ষষ্ঠ বক্তা আমার অপরিচিত; তাঁহার নিকট বোধ হয় আমি অপরাধী হইয়াছি। তাঁহার বক্তৃতা সবে আরম্ভ হইতেছিল, কর্ত্তব্যানুরোধে আমাকে সে বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। যে রাজ্যের ভালবাসা লইয়া তিনি আলোচনা করিতে উঠিয়াছিলেন, তাহা অপবিত্র, পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ। তাহার উদ্দেশ্য কি ছিল, ব্যঙ্গ কি বাহাদুরী, তাহা জানি না; কিন্তু ব্যঙ্গ হইলেও তাহা পরিহার্য্য; সে ভালবাসা লইয়া ভালবাসার নাম কলঙ্কিত করা ভদ্রলোকের কদাচই উচিত নহে। নরকের আন্দার ব্যঙ্গ কি? ব্যঙ্গ বিদ্রূপের একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। যে পাপচ্ছবি বাহ্যদৃশ্যে আপাততঃ সুন্দর

যা সুখকর বলিয়া অবোধের চক্ষে প্রতীয়মান হয়, তাহার অভ্যন্তরভাগ যে বিষময়, পরিণামে তাহা যে হলাহল প্রসব করে, এই তত্ত্ব রঙ্গরসের উজ্জ্বলচিত্রে প্রতিফলিত করাই ব্যঙ্গরচনার প্রধান উদ্দেশ্য। পাপে যাহাতে ঘৃণা হয়, সেই ভাবে পাপচিত্র প্রতিফলিত করাই চিত্রকরের নৈপুণ্য। কিন্তু তাই বলিয়া সকল স্থলেই কি সেই চিত্র আঁকিতে হইবে? যেখানে গোলাবের সৌগন্ধ প্রদর্শন করিতেছ, তথায় নরকের কৃমিকীটময় পুরীষ-প্রণালী আলোড়ন করিয়া, তাহার দুর্গন্ধের সহিত তুলনা করিয়া কি কুসুমের আপেক্ষিক সৌন্দর্য্য বুঝাইতে হইবে? গোলাবের সহিত বেল মল্লিকা, টগর কলিকা, শিমূল পারুলের পার্থক্য দেখাইতে পারি। গলিত তৃণের গন্ধে তুলনা করিয়া গোলাবের গর্ব্ব বাড়িবে কি? স্বর্গের বর্ণনায় নরকের তুলনা কেন? পৃথিবীর উপর স্বর্গের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেই যথেষ্ট হইল। নরক আপনার দুর্গন্ধে, আপনার বীভৎস রসে আপনি ধিক্কারজনক হইয়া আছে, তাহার দৃশ্য স্বর্গদৃশ্য বলিয়া কদাচই ভ্রম হইতে পারে না। এমন নির্ব্বোধ ভ্রান্ত যদি কেহ থাকে, তাহার জন্য সাহিত্যকারের কষ্ট করা পণ্ডশ্রম মাত্র। অপরিচিত বক্তাকে এই জন্যই আমি নরক ঘাঁটিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। যদি অসৌজন্য হইয়া থাকে, বোধ হয় তিনি এইবার বুঝিয়া ক্ষমা করিতে পারেন।

সপ্তম ও শেষ বক্তা স্বয়ং সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর বক্তৃতা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ভালবাসার ব্যাখ্যা, দ্বিতীয় ভাগে হতাশা-জড়িত আত্মপ্রণয়ের ইতিহাস। বক্তৃতার

প্রথমাংশে আমার বলিবার কথা কিছুই নাই, দ্বিতীয়ভাগে বক্তব্য বিলক্ষণ আছে। বক্তৃতার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসীর আকার ইঙ্গিত দেখিয়া, সন্ন্যাসীর ভাবভক্তি বুঝিয়া আমরা যে সন্দেহ করিয়াছিলাম, এখন সেই সন্দেহই সার্থক হইল। সংসারের একটা প্রবল ঝটিকা যে ইহাঁর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তুফানে পড়িয়াই যে ইনি কূল হারাইয়াছেন, আমাদের এই সন্দেহ এখন সমূলক বলিয়া উহাঁর নিজের কথাতেই প্রতিপন্ন হইল। সন্ন্যাসী ঘোর প্রেমিক, ভালবাসার ক্রীতকিঙ্কর। কিন্তু সংসারে ভালবাসার সাধ ইহাঁর পূর্ণ হয় নাই। প্রণয়পাত্রী বিদ্যমান থাকিতেও ইহাঁর প্রণয়পিপাসা মিটাইতে পারেন নাই। ইনি ভালবাসিতেন, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াও সে ভালবাসার প্রতিদান পাইতেন না বলিয়া মরমে মরিয়া ছিলেন। কথা কিছু বিচিত্র নয়। কার এমন হয় না? ভালবাসা যতই নিঃস্বার্থ হউক, প্রতিদান না পাইলে নিঃশ্বাস না ফেলিয়া নিশ্চিন্ত থাকে এমন সংসারী কে কোথায় দেখিয়াছ! যে প্রতিদান চায় না, যে বলে—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥

সঙ্গে সঙ্গে হতাশের তপ্তশ্বাস কি তাহার বহে না? তবে তাহার ভালবাসাকে নিঃস্বার্থ বলি কেন, তাহার ভালবাসাকে প্রথম শ্রেণীর ভালবাসা বলি কেন? তাহার কারণ আছে। প্রতিদান পাইল না বলিয়া তাহার ভালবাসার কখন ত্রুটি হইবে না, তাহার ভালবাসা কখনও হ্রাস হইবে না। যাকে

ভালবাসি সে যদি আমায় দেখিতে পারিত, সে যদি আমায় কোলে লইত, তাহা হইলে ত হাতে স্বর্গ পাইতাম। হাতে হাতে স্বর্গলাভ আমার অদৃষ্টে নাই, অতএব স্বর্গের ধ্যান করিয়াই আমি ইহজীবনে স্বর্গসুখ অনুভব করিব। ইহারই নাম উৎকৃষ্ট প্রণয়, ইহারই নাম নিঃস্বার্থ ভালবাসা। সীতা সাবিত্রী এই ভালবাসার আদর্শরূপিনী। পতিপরিত্যক্তা সীতা বনবাসে বিসৃষ্টা হইয়াও দেবরসমীপে বিদায় লইয়া বলিতেছেন, "দেখো বৎস! আর্য্যপুত্রের যেন কোনরূপ কষ্ট না হয়। আর তিনি গৃহিণীপদবী হইতে আমাকে বিসর্জ্জন করিলেন; কিন্তু তিনি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর, তাঁহার রাজ্যমধ্যে আমিও একজন প্রজা, এটা যেন তাঁহার মনে থাকে। আমি এই বনে বসিয়াই যাবজ্জীবন তপস্যা করিব, যেন জন্মান্তরে তাঁহাকেই আবার পতিরূপে প্রাপ্ত হই।" বিনাদোষে বিসৃষ্টা হইলেও, রামচরণে সীতার ভক্তি অচলা। কিন্তু তাই বলিয়া, পতিপ্রসাদলাভে বঞ্চিতা হইয়া কি সীতার শোণিতাশ্রু বক্ষ ফাটিয়া প্রবাহিত হয় নাই? সত্যবানের পরমায়ু ফুরাইয়াছে জানিয়াও সাবিত্রী তাঁহার চরণে চিত্তসমর্পণ করিলেন। সাবিত্রী নিঃস্বার্থ প্রেমের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা। সাবিত্রী সতীকুলশিরোমণি। কিন্তু তাই বলিয়া কি সাবিত্রী সত্যবানের বিয়োগদুঃখে কাতরা নহেন? প্রাণান্তপণে ভালবাসিয়া, ভালবাসা ভোগ করিবার লালসা কাহার চিত্তে সমুদিত হয় না? ভালবাসায় বঞ্চিত হইলে বাড়বানলপ্রবাহের তপ্তধারা কাহার চিত্তে প্রবাহিত হয় না? সীতা সাবিত্রী প্রণয়রাজ্যের দেবতাস্বরূপিনী।

তোমার আয়েষা বল, রেবেকা বল, সকলই এই দেবতার ছাঁচে ঢালা। সকলেই নিঃস্বার্থ প্রেমের আদর্শভূতা, কিন্তু অতৃপ্ত প্রণয়ের অন্তর্দ্দাহে বিদগ্ধা।

আমাদের সন্ন্যাসীর দশাও ঠিক তাই। প্রণয়পাত্রী যতদিন ছিল, ততদিন ইনি হতাশার বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও, অসহ্য অনলদাহে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়াও, কোনমতে আত্মসংযম করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রণয়পাত্রীকে হারাইয়া ইনি আর চিত্তের বন্ধন সংযত করিয়া রাখিতে পারিলেন না। সকল বন্ধন তখন একবারে শ্লথ হইয়া পড়িল। অঙ্গ অবশ, চিত্ত অধীর, বুদ্ধি বিহ্বল, মস্তিষ্ক তরল, প্রাণ উদাসীন হইয়া পড়িল। উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত চিত্তে, অতীত দুঃখের স্মৃতি লইয়া, ভগ্নপ্রণয়ের পিপাসা লইয়া, অসম্পূর্ণ সুখের মায়া লইয়া, অতৃপ্ত বাসনার ছায়া লইয়া, বিরাগ বিরক্তির দায়ে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিলেন। কালসহকারে, বুদ্ধি চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্য সম্পাদন হইলে, ইনি মনে করিলেন, সন্ন্যাসেই ইহাঁর রোগের প্রতিকার হইবে; মনে করিলেন, প্রিয়জনের প্রেমোচ্ছ্বাস পৃথিবীময় ঢালিয়া দিয়া অন্তরের ভার লাঘব করিবেন; অতৃপ্ত বাসনার বেগ সংসারের বাহিরে বিসর্জ্জন করিয়া, মমতার মোহমন্ত্র হইতে মুক্ত হইবেন।

কাজটা বড়ই ভুল হইয়াছে। এইখানেই আমার আপত্তি, এইস্থলেই সন্ন্যাসীর সহিত আমার ঘোরতর মত-বিরোধ। যাহা অসাধ্য, যাহা অসম্ভব, তাহার সাধনা করিতে যাওয়া, সন্ন্যাসীর মত বুদ্ধিমান জীবের উচিত হয় নাই। বাসনার বোঝা বুকে বহিয়া কি সংসারসাগর পার

হওয়া যায়? সংসারের সাধ না মিটিলে কি সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া যায়? পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, অনশনব্রত কি সেই সময় অবলম্বন করা যায়? সকলেরই সময় আছে, সকলেরই সীমা আছে। সময় লঙ্ঘন করিয়া, সীমা অতিক্রম করিয়া, অসম্ভবের আরাধনা করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে কেন? তাও কি কখনও হয়? তাহা হইলে শাস্ত্র মিথ্যা হইবে, সৃষ্টি বিপর্য্যস্ত হইবে। এ সুখের সংসার ভগবান কি বৃথায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন! কিসের জন্য সংসার, কিসের জন্য গৃহস্থাশ্রম, কিসের জন্য মানবজীবন? সংসারধর্ম্ম পালন না করিয়া মানুষ অরণ্যাশ্রয়ী হইবে, সৃষ্টিকর্ত্তার এমন অভিপ্রায় নয়, শাস্ত্রকারের এমন উপদেশ নয়। শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট ভগবানের অভিপ্রেত এই যে মানুষ জন্মিবামাত্রই গৃহী হয়, অতঃপর শাস্ত্রীয় সংস্কারে পূত হইলে তাহাকে আশ্রমী বলা যায়। অতএব মানব প্রথমাবস্থায় যথাবিধি গৃহস্থধর্ম্ম পালন করিবে।

জাতমাত্রো গৃহস্থঃ স্যাৎ সংস্কারাদাশ্রমী ভবেৎ।
গার্হস্থ্যং প্রথমং কুর্য্যাৎ যথাবিধি মহেশ্বরি ॥

তন্ত্রের এই মহতী উক্তি পার্ব্বতীর প্রতি মহাদেবের উপদেশ বলিয়া কথিত আছে।

গৃহে থাকিয়া গৃহস্থকে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইবে ইহাই ভগবানের আদেশ, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। এখন বুঝিয়া দেখুন, সংসার কাহাকে বলে, সংসারধর্ম্ম কিরূপে পালন করিতে হয়, আর পালন করিলেই বা কিরূপ ফললাভ করা যায়। সংসারের দুই মূর্ত্তি। সংসার বিলাস-

ভোগের নিকুঞ্জকানন; আবার সংসারই তত্ত্বজ্ঞান সাধনের পবিত্র তপোবন। সংসারের অধিষ্ঠাত্রী সংসারলক্ষ্মীরও সুতরাং দুই মূর্ত্তি। গৃহিণী সংসারমায়ার রজ্জুরূপিনী, আবার গৃহিণীই আমাদের তত্ত্বজ্ঞানলাভের সহধর্ম্মিণী। এই মায়াময়ীকে লইয়া মায়াপাশ ক্রমশঃ ছিন্ন করিতে হইবে; বিলাসিনীর বসনাঞ্চল ধরিয়া বৈরাগ্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে; আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া, সন্তরণকৌশলে, অনন্ত-ভবসাগর পার হইয়া যাইতে হইবে। সাঁতারের এই ত রীতি। গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবাইও, কিন্তু সাবধান! মাথা ডুবাইয়া যেন মাথাটি খাইও না। নাক মুখ চক্ষু অবশ্যই জাগাইয়া রাখিতে হইবে। আর এক কথা, পঙ্কে পা দিও না। পাপপঙ্কে পা পড়িলে, পঙ্কে ডুবিতে আরম্ভ করিলে, আর উঠিতে পারিবে না। সাঁতার সেখানে চলিবে না!

সংসার বড় বিচিত্র স্থান। সংসাররহস্য বুঝিয়া যিনি সাবধানে চলিতে পারেন, তিনিই সংসারী। বুঝিবার বুদ্ধি যাঁহার নাই, শাস্ত্র তাঁহার সহায়, সমাজ তাঁহার নেতা, দৃষ্টান্ত তাঁহার আদর্শ। যদি ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে চাও, যদি সংযম অভ্যাস করিতে চাও, যদি ভালবাসার প্রসর বৃদ্ধি করিতে চাও, যদি বিশ্বপ্রেমিক হইতে চাও, যদি হৃদয়মধ্যে ভগবদ্ভক্তির বীজরোপণ করিতে চাও, তবে সংসারই তাহার উপযুক্ত শিক্ষালয়। মানুষ স্বভাবতঃই ভোগাভিলাষী, মানুষ কামনার দাস। সংসারে থাকিয়া, নিয়মমত, যেটুকু আবশ্যক, যেটুকু বিহিত, সংসাররক্ষার জন্য যেটুকু প্রয়োজন,

সেই পরিমাণে ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবে; আর সঙ্গে সঙ্গে সংযম অভ্যাস করিতে শিখিবে। উদ্দাম হৃদয়ের দুরন্ত বাসনা, সংযমের লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। প্রলোভনের শতমধ্যস্থলে থাকিয়াও এই আত্ম-সংযম তোমায় অভ্যাস করিতে হইবে। সেই শিক্ষাই ত প্রকৃত শিক্ষা।

বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে।
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥

অরণ্যে এ শিক্ষার উপায় নাই, ইহার প্রকৃত স্থান সংসার। সংসার প্রলোভনময়। সেই প্রলোভনের মাঝে থাকিয়াই লোভসম্বরণ অভ্যাস করিতে হইবে। আর শিক্ষাকার্য্যে, সংসারে তোমার সহায় কত? শাস্ত্র ভ্রুকুটী করিতেছেন, সমাজ সহস্র চক্ষে চাহিয়া আছেন, গুরুজন দণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, বান্ধবে হিতচেষ্টা করিতেছেন, আর স্বয়ং গৃহলক্ষ্মী অমৃতালাপে অভিষিক্ত করিতেছেন। অরণ্যে তোমার কে আছে ভাই?

ভালবাসার প্রসর বৃদ্ধি করিবার এমন প্রশস্ত ক্ষেত্র সংসারের মত আর কোথায় পাইবে? গুরুজনের প্রতি ভক্তি, সন্তানের স্নেহ, প্রেয়সীর প্রীতি, বান্ধবের মিত্রতা, কুটুম্ব স্বজনের সম্বর্দ্ধনা, প্রতিবেশীর সদালাপ, অতিথি অভ্যাগতের আদর, দীনদুঃখী, ভিক্ষুক যাচকের প্রতি দয়া এ সকলের চর্চ্চা অরণ্যে কোথায় করিবে? সংসারক্ষেত্রে, এক ভালবাসা, কত প্রকারে বিস্তৃত, কতদিকে প্রচারিত সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে দেখুন। শুধু তাই নয়। হিন্দুর আবার এম্‌নি নিয়ম, এম্‌নি বিধিব্যবস্থা যে, জীব জন্তু, পশু

পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ শিলা, সলিল আকাশ, বায়ু বহ্নিকেও পূজা করিতে হইবে, দেবতা জ্ঞানে নমস্কার করিতে হইবে। গৃহস্থ পশু পালন করে, প্রাণের ভক্তি দিয়া; নবান্নের দিনে সর্ব্বভূতে অন্নদান না করিয়া আপনি ভোজন করে না। বিশ্বপ্রেম শিখিবার এমন সুবিধান আর কোথায় আছে বল দেখি?

কিন্তু বিশ্বেশ্বরকে না চিনিলে ত বিশ্বপ্রেম শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। জগৎ যাঁহার রাজ্য, জগতের যিনি অধীশ্বর; জগৎ যাঁহার দেহ, জগতের যিনি জীবন; সেই জগদীশ্বরকে ভালবাসিতে না শিখিলে জগৎপ্রেম পরিবর্দ্ধিত হইবে কেন? সংসারে সেই ভগবদ্ভক্তি শিক্ষার বিধান ত প্রতিপদেই আছে। গর্ভাধান হইতে চিতারোহণ পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় সংস্কারে পূত হইতে হইবে। দেহান্তেও পিণ্ডাধিকারীর হাতে আত্মার মঙ্গলবিধান হইতেছে। আর জীবিতকালে, জ্ঞানোদয় হইতে না হইতে দেবতার চরণে প্রণাম করিতে হইবে, অন্তিমে "গঙ্গানারায়ণব্রহ্ম" বলিয়া তনুত্যাগ করিতে হইবে। সংসারী প্রতিপদে, প্রতি কার্য্যে, প্রতিদিন, প্রতিপর্ব্বে, প্রতিদণ্ডে, প্রতিনিঃশ্বাসেই কোন না কোন প্রকারে দেবতার চরণে শরণ লইবে। প্রভাতে জাগরিত হইবে দেবতার নাম লইয়া, রাত্রিকালে শয়ন করিবে দেবতার চরণে প্রণাম করিয়া। নিদ্রিত হইয়াও নিস্তার নাই। দৈবাৎ যদি স্বপ্ন দেখত অমনি "দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং।" এই গেল নিত্যকর্ম্ম। ইহা ভিন্ন শ্রাদ্ধ শান্তি, ব্রত নিয়ম, জপ হোম, পূজা, উৎসব, যাগযজ্ঞ, দানধ্যান, স্বস্ত্যয়ন পুরশ্চরণ প্রভৃতি অসংখ্য অনন্ত

ক্রিয়াকলাপ কিসের জন্য অনুষ্ঠিত হয়? কাহার চরণে উৎসর্গ হয়? দেবভক্তি শিখিবার এমন সুন্দর রীতি হিন্দুর সংসার ছাড়া আর কোথায় আছে?

এইরূপে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে করিতে সংসারে ভাল বাসার চর্চ্চা করিতে করিতে, তোমার হৃদয় উদার, তোমার ধারণাশক্তি সম্প্রসারিত হইয়া আসিবে। কেবল ব্যক্তি-বিশেষকে ভালবাসিয়া, কেবল স্বজন-বান্ধবকে ভালবাসিয়া তোমার আর তৃপ্তি হইবে না। সংসারের ভোগবাসনা তৃপ্ত হইলে, সাংসারিক ভালবাসার সাধ পূর্ণ হইলে, শেষদশায়, বিশ্বসংসারকে ভালবাসিবার জন্য তোমার হৃদয় ব্যগ্র হইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝিবে যে বিশ্বেশ্বরই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ-স্বরূপ। তিনিই সব, তাঁহার সব। সংসার অনিত্য, সংসার মিথ্যা। ইহজগৎ থাকুক আর না থাকুক, তিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার স্বত্বা চিরবিরাজমান। সংসার শোকদুঃখে, মায়া-মোহে, মিথ্যা প্রপঞ্চে অভিভূত। জগতে একমাত্র সত্যবস্তু তিনি। তাঁহার নাশ নাই হ্রাস নাই বিষাদ নাই, বিচ্ছেদ নাই। অতএব তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিলেই ভালবাসার চরমসীমায় উপনীত হওয়া যায়, ভালবাসার উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে চরিতার্থ হয়। তাঁহাকে ভালবাসিলে ভালবাসার অভাব থাকিবে না, ভালবাসায় কখনও বঞ্চিত হইতে হইবে না, ভালবাসা অতৃপ্ত থাকিবে না, ভালবাসায় বিরহতাপের সংস্পর্শ থাকিবে না, ভালবাসায় হ্রাস বৃদ্ধির শঙ্কা থাকিবে না, ভালবাসিতে আর কাহাকেও বাকী থাকিবে না। জগতে তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। জগতের সর্ব্বত্রই

তিনি ওতপ্রোত হইয়া আছেন। জগৎ তাঁহারই স্বত্বায় প্রতিষ্ঠিত। জগৎ তন্ময়।

আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥

ইহারই নাম তত্ত্বজ্ঞান। বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানবের মনে এই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। সংসারভোগের বাসনা হইতে বিরতির নামই বৈরাগ্য। ভোগতৃষ্ণার লেশমাত্র যতক্ষণ বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ কদাচই প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইবে না। সংসারভোগ করিতে পাইলাম না বলিয়া, আক্ষেপ করিয়া যিনি সংসার ত্যাগ করেন, তাঁহার সে ত্যাগ বৈরাগ্যজনিত নহে। সংসারভোগের সাধ যাঁহার মিটিয়াছে, সংসারে স্পৃহার লেশমাত্র যাঁহার নাই, সংসার ত্যাগে যাঁহার কোন কষ্টই নাই, সেই ব্যক্তিরই প্রকৃত বৈরাগ্য হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানের সহিত বৈরাগ্য সমুদিত হইলে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন। শাস্ত্রে তাহার বিধান আছে—

তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং জায়তে যদা।
তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ॥

কিন্তু শাস্ত্র বড় উদার, শাস্ত্র বড় বিচক্ষণ। শাস্ত্র সাবধান করিতেছেন, তুমি কেবল আপনার পথ চাহিলে চলিবে না। তোমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেও, সংসারকে কাঁদাইয়া তুমি যাইতে পাইবে না। গৃহে যদি তোমার বৃদ্ধ পিতা মাতা থাকেন, পতিব্রতা প্রণয়িনী থাকেন, অপ্রাপ্তবয়া পুত্র

থাকে, তবে তাহাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গেলে তুমি ঘোর পাতকী হইবে। অধিক কি স্বজন বন্ধুর মনে কষ্ট দিয়াও তুমি যাইতে পাইবে না।

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাম্।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ॥
মাতৄঃপিতৄন্ শিশূন্ দারান্ স্বজনান্ বান্ধবানপি।
যঃ প্রব্রজতি হিত্বৈতান্ স মহাপাতকী ভবেৎ॥

এ সকল বাধা যদি তোমার থাকে, তবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেও, গৃহে বসিয়াই তুমি আপনার কর্ম্মসাধন কর। যিনি জ্ঞানী, যিনি নিষ্কাম, যিনি জিতেন্দ্রিয়, তিনি গৃহে থাকিলেও সন্ন্যাসী। আর যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, ইন্দ্রিয়জয় হয় নাই, বাসনার লয় হয় নাই, বনে বনে ভ্রমণ করিলেও তিনি ঘোর সংসারী। জনকাদি রাজর্ষিরা গৃহে থাকিয়াও প্রকৃত সন্ন্যাসধর্ম্মী ছিলেন। আর আজিকার কালে এই যে নাগা ফকির, সাধু সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব বাউল, ন্যাড়া নেড়ী, ভৈরব ভৈরবী গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ ও গাঁজার শ্রাদ্ধ করিতে থাকে; ইহারা সংসারের দাস, অর্থের দাস, উদরের দাস, কামনার আজ্ঞাকারী অনুগত কিঙ্কর বৈ ত নয়। যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী, যিনি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ, নরদেহেই তিনি জীবন্মুক্ত। পুণ্যফলেই ঈদৃশ সাধুর দর্শন পাওয়া যায়। সৌভাগ্যবলে সাধু-দর্শন হইলে, শাস্ত্র বলেন, সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিবে।

কুলাবধূতস্তত্ত্বজ্ঞো জীবন্মুক্তো নরাকৃতিঃ।
সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ॥

সন্ন্যাসী হও না কেন ভাই! সন্ন্যাসী হইতে কে নিষেধ করিতেছে? সন্ন্যাসের বিধান শাস্ত্রেই ত আছে। আগে যোগ্য হও, তবে যাজন করিও। ইংরেজীতেও একটা কথা আছে—First deserve, then desire. যদি যোগ্য হইয়া থাক, যদি সময় হইয়া থাকে, শাস্ত্রোক্ত উপরিকথিত কোনরূপ বাধা যদি না থাকে, তবে শাস্ত্রীয় বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া সচ্ছন্দে সংসার ত্যাগ কর। ঘর সংসার গুছাইয়া দিয়া, স্বজন বন্ধু, প্রতিবাসী গ্রামবাসী, এমন কি পর যে শত্রু তাহাকেও পরিতুষ্ট করিয়া, তাহাদের অনুমতি লইয়া, পরমদেবতাকে প্রণাম করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নির্ম্মম, নিষ্কামচিত্তে জিতেন্দ্রিয় হইয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইবে।

সম্পাদ্য গৃহকর্ম্মাণি পরিতোষ্য পরানপি।
নির্ম্মমো নিলয়াদ্‌গচ্ছেন্নিষ্কামো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
আহূয় স্বজনান্ বন্ধূন্ গ্রামস্থান্ প্রতিবাসিনঃ।
প্রীত্যানুমতিমন্বিচ্ছেৎ গৃহান্নির্গমিষুর্জ্জনঃ॥
তেষামনুজ্ঞামাদায় প্রণম্য পরদেবতান্।
গ্রামং প্রদক্ষিণীকৃত্য নিরপেক্ষো গৃহাদিয়াৎ॥

শাস্ত্রের এই বিধানে বিশ্বপ্রেমের কি বিচিত্রচ্ছবি চিত্রিত হইয়াছে দেখুন। সংসারে বৈরাগ্য হইয়াছে বলিয়া, সংসারকে যেন দ্বেষ করিও না। যিনি সংসারদ্বেষী, তিনি আবার কিসের প্রেমিক? সংসারদ্বেষী বলিয়া ত তিনি সংসার ত্যাগ করিতেছেন না; কেবল আপনার সংসারকে ভালবাসিয়া তখন আর তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না বলিয়া

তিনি সংসারের বাহিরে যাইতেছেন। সমগ্র বিশ্বসংসারকে তখন তিনি আপনার বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাই—বিশ্বময় বিচরণ করিবার জন্য তিনি বহির্গত হইতেছেন।

সমগ্র বিশ্বসংসার তাঁহার আপনার হইয়াছে, আর যিনি বিশ্বেশ্বর, তাঁহার চরণেও বিশ্বপ্রেমিকের ভালবাসা গিয়া পহুঁছিয়াছে। তখন তিনি জানিয়াছেন যে আমারই এই বিশ্ব, আমারই সেই বিশ্বনাথ। সন্ন্যাসী গৃহত্যাগ করিয়া গুরুপ্রণাম করিতে গেলে, গুরুদেব তাঁহাকে উঠাইয়া কাণে কাণে বলিয়া দিবেন, "হে প্রাজ্ঞ! তুমি আর কেহ নয়, তুমিই তিনি। অতএব এখন, 'আমিই তিনি, আর তিনিই আমি,' এই মন্ত্র নিয়ত জপ কর।"

গুরুরুত্থাপ্য তং শিষ্যং দক্ষকর্ণে বদেদিদম্।
তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়॥

জগতের সহিত, আর জগৎকর্ত্তার সহিত তখন তাঁহার এমনি একাত্মভাব হইয়া গিয়াছে যে, আপনার সহিত জগদাত্মার পার্থক্য তিনি আর দেখিতে পাইতেছেন না। যে গুরু চিরপ্রণম্য, চিরপূজ্যপাদ, তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে, যিনি বিশ্বরাজ্যের অধীশ্বর তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলেও তখন তাঁহার আপনাকেও প্রণাম করা হয়। প্রণামকালে এইরূপ গোলে পড়িয়া তিনি তখন বলিতেছেন,—

নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।
ত্বমেব তৎ তত্ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোঽস্তুতে॥

জগদাত্মার সহিত তাঁহার আত্মা তখন মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। তিনি আর তখন পৃথক একটা মনুষ্য নাই।

তাঁহার নামরূপ তখন লোপ হইয়াছে, তাঁহার জাতিকুল ধ্বংস হইয়াছে, তাঁহার শিখাসূত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে, বিশ্বময় তখন তিনি কেবল বিশ্বরূপের রূপচ্ছটা দেখিতে পাইতেছেন। পরমাত্মার ধ্যান করিতে গিয়া তিনি দেখিতেছেন যে তাহাতে নিজাত্মারই ধ্যান করা হইতেছে,—

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সদ্রূপেণ বিভাবয়ন্।
বিস্মরেন্নামরূপাণি ধ্যায়ন্নাত্মানমাত্মনি॥

পরমানন্দে পরমাত্মার ধ্যান করিতে করিতে, সন্ন্যাসী ক্ষিতিতলে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন। তাঁহার শঙ্কা নাই সঙ্গ নাই; গৃহ নাই মমতা নাই; অহঙ্কার নাই রাগ নাই।

অনিকেতঃ ক্ষমাবৃত্তো নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সন্ন্যাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ॥

ভালবাসার ভাব তখন তাঁহার পূর্ণ হইয়াছে। স্থাবর জঙ্গম তখন সকলই তাঁহার প্রেমাধীন। তাঁহার প্রেমে আর পক্ষপাত নাই, সকলেই সমান দৃষ্টি, সকলই ব্রহ্মময়। দেবতা মানুষ হইতে সামান্য কীট পর্য্যন্ত সকলই তাঁহার চক্ষে সমান।

সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্যাৎ দেবে কীটে তথা নরে।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট্ সর্ব্বকর্ম্মসু॥

ইহারই নাম সন্ন্যাসী, ইহারই নাম বিশ্বপ্রেমিক্, ইহারই নাম জীবন্মুক্ত যোগী। এমন প্রেমিকের পায়ে প্রণাম করিতে পাইলেও সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতে হয়। যাঁহার অদৃষ্টে আছে, চেষ্টা করিলে, কালক্রমে এরূপ অমূল্য পদবী তিনি লাভ করিতে পারেন। এক জন্মে যাঁহার

না হইবে,—একজন্মে যে সকলেরই হইবে এমন সম্ভাবনা কি, জন্ম জন্মান্তরে চেষ্টা কর, অবশ্যই সফলকাম হইবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সময় নিয়ম অতিক্রম করিয়া কেহ কোন চেষ্টা করিও না। সকল কাজেরই সময় আছে, নিয়ম আছে। শাস্ত্র বলিয়া দিয়াছেন, বাল্যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে, যৌবনে অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার-সুখ ভোগ করিবে, প্রৌঢ় বয়সে ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে, আর শেষ-দশায় সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে।

বিদ্যামুপার্জ্জয়েৎ বাল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্ম্যাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ ॥

কথাটায় আবার কেহ যেন ভ্রান্ত না হন। ধর্ম্মকর্ম্ম কেবল প্রৌঢ় বয়সে করিবে, আর অন্যকালে অধর্ম্ম করিবে, এরূপ অর্থ যেন কেহ করিয়া না বসেন। ধর্ম্মাচরণ সকল কালেই করিবে; সকলই ধর্ম্মাচরণ। বিদ্যা উপার্জ্জন, সংসারভোগ, সন্তান উৎপাদন, সন্তান পালন এ সকলও ধর্ম্মকর্ম্মেরই অঙ্গবিশেষ। যে বয়সে যে ধর্ম্মের আচরণ করিবে, তাহারই বিধান উপরি-উক্ত শ্লোকে কথিত হইয়াছে। সোপানপরম্পরা যথাক্রমে অতিক্রম করিয়া মানবজীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে হয়। সেই সোপানমার্গই উক্ত শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "প্রৌঢ়ে ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে," ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সে সময় ভোগ-বাসনা শিথিল হইয়া আসিয়াছে, অতএব চরম লক্ষ্য ভাবিয়া তখন পরকালের পথপানেই অধিকতর দৃষ্টিপাত করিবে। শাস্ত্রার্থ যাঁহার বুঝিবার শক্তি আছে, ভাল করিয়া সকল

কথা বুঝাই তাঁহার উচিত। আধা-শিক্ষা বড় অনিষ্টকর। আর যাঁহার বুঝিবার শক্তি নাই, তিনি কেবল মানিয়া চলুন, ফল সমানই হইবে। কিন্তু যিনি বুঝিয়াও বুঝিবেন না, অথচ অহঙ্কার করিয়া মানিবেন না; উৎসন্ন যাইবার পথ তাঁহার জন্য খোলা আছে। নরকের পথ বড় সুগম। যে পথে উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, তাহাই ত দুরারোহ।

এতক্ষণ আমি তন্ত্র-শাস্ত্র হইতেই বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সংসার ও সন্ন্যাস-ধর্ম্মের কথা বিবৃত করিয়াছি। তন্ত্রের বক্তা মহাযোগী মহাদেব, শ্রোত্রী স্বয়ং পার্ব্বতী। তন্ত্রের একটি নাম আগম। আগমের অর্থ কি?—

"আ"গতং পঞ্চবক্ত্রাত্তু "গ"তঞ্চ গিরিজাননে।
"ম"তঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগমমুচ্যতে॥

আ, গ, ম, এই তিন অক্ষরে আগম শব্দ গঠিত। ইহার অর্থ এইরূপ। যাহা পঞ্চাননের মুখ হইতে "আ"গত, যাহা গিরিজার মুখে "গ"ত, অর্থাৎ তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট, এবং যাহা বাসুদেবেরও "ম"তনিষ্ক, তাহারই নাম "আগম"। পঞ্চানন পঞ্চমুখে পঞ্চসত্য করিয়া গিরিরাজনন্দিনীকে বলিয়াছেন, "শুন প্রিয়ে! আমি বলিতেছি, আগমমার্গ বিনা কলিযুগে জীবের গত্যন্তর নাই।"

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে॥

তন্ত্রশাস্ত্র মহাদেবের মুখবিনির্গত, এবং নারায়ণের অনুমোদিত। এখন নারায়ণের নিজমুখের বাণী যদি শুনিতে চাও, তবে গীতার আশ্রয় লইতে হয়। আমাদের

সন্ন্যাসীও তাঁহার বক্তৃতায় গীতার এক-আধটা শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব সন্ন্যাস সম্বন্ধে গীতা কি বলেন, এস্থলে আমাদের একবার দেখা উচিত। ভালবাসার ব্যাখ্যায় ভগবদ্গীতার সন্ধান না লইলেও মনস্তৃপ্তি হয় না। ভালবাসাতেই গীতার সৃষ্টি, ভালবাসাতেই ভগবানের মুখে গীতাশাস্ত্রের অমৃত-বৃষ্টি। অর্জ্জুন ভগবানের ভালবাসার পাত্র। প্রিয়সখার প্রেমাধীন হইয়া, ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার রথের সারথ্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধকালে বীরকুলচূড়ামণি অর্জ্জুনের মনে অকালবৈরাগ্যের উদয় হইল। কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইলে, অর্জ্জুন বলিলেন,—"ঠাকুর! উভয়সেনার মাঝখানে রথখানা একবার রাখ দেখি, আমি বুঝি কাহার সঙ্গে আমায় যুঝিতে হইবে।" রথ উভয়সেনার মধ্যস্থলে স্থাপিত হইল। অর্জ্জুন দেখিলেন উভয়পক্ষেই আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতি কুটুম্ব, ভাই বন্ধু, শ্বশুর শ্যালক পরস্পর বিজিগীষু হইয়া অস্ত্রধারণ করিয়াছে। দেখিয়া বীরের হৃদয় করুণরসে গলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ইহাদের রক্তে পৃথিবী প্লাবিত করিয়া সিংহাসন লাভ করিতে হইবে? ছার রাজ্যের জন্য এই স্বজন-শোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিব? না ঠাকুর! আমা হইতে তা হইবে না। ত্রিভুবনের রাজত্ব পাইলেও আমি ইহাদের গায়ে হাত তুলিতে পারি না। এই নাও তোমার গাণ্ডীব। আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলাম। এখন উহারা যদি নিরস্ত্র পাইয়া আমায় বধ করিয়া ফেলে তথাপি আমি কথাটি কহিব না।"

ভূভারহারী দেখিলেন ঘোর বিপদ। পাণ্ডবের যিনি ভরসা, বীরকুলের যিনি রাজা, তিনি এসময় ভ্রান্ত হইয়া স্বধর্ম্ম ও স্বকর্ত্তব্যে বীতচেষ্ট হইতেছেন। তাই প্রিয়সখাকে কর্ত্তব্য বুঝাইবার নিমিত্ত তিনি তত্ত্বকথা শুনাইতে লাগিলেন। ইহারই নাম গীতা। গীতার সকল ধর্ম্মের, সকল শাস্ত্রের সার কথা আছে। সংসার-ধর্ম্ম সন্ন্যাস-ধর্ম্ম মোক্ষ-ধর্ম্ম, জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ কর্ম্মমার্গ, প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্বের সূক্ষ্মবিধি গীতাশাস্ত্রে ভগবানের ভাষায় উক্ত হইয়াছে। গীতা পরাৎপরের মুখনিঃসৃত পরম শাস্ত্র। সেই গীতায় সন্ন্যাসের কথা কিরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে দেখা যাক্।

ভগবান বলিতেছেন—

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যং সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥

"হে বীরবর! যাঁহার দ্বেষ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি দ্বন্দ্বরহিত, তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী। সংসার-বন্ধন হইতে তিনি সচ্ছন্দে মুক্ত হইতে পারেন।" কিন্তু সন্ন্যাসী হইলেই যে একবারে সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে, অথবা কেবল কর্ম্মত্যাগ করিলেই যে তাহাকে সন্ন্যাসী বলা যায়, ভগবান এমন কথা বলেন না। তাঁহার মতে—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥

ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া যিনি বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। নতুবা যিনি কেবল অক্রিয় অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগী অথবা নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিতে

হোম যজ্ঞাদি যে সকল কর্ম্ম হয় তাহা ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসীও নহেন যোগীও নহেন।

ভগবান সন্ন্যাসকেই আবার যোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং ফলসংকল্প পরিত্যাগ না করিলে যে যোগী হওয়া যায় না, পরবর্ত্তী শ্লোকে সে কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।—

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥

এতদ্বারা ভগবানের অভিপ্রায় এই বুঝা যাইতেছে যে, তুমি যোগী হও, সন্ন্যাসী হও, তথাপি তোমায় কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে না। কেবল কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলেই তোমার যোগসাধন সম্পন্ন হইবে। স্বর্গাদি ফললাভের কামনায় যে কর্ম্ম করে সে যোগী নয়, সংসারী। কিন্তু ফললাভের কামনা ত্যাগ করিয়া যে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া, শাস্ত্রবিহিত বলিয়া, ভগবানের কর্ম্ম করিতেছি বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে সংসারী হইলেও যোগী অথবা সন্ন্যাসী। ইহারই নাম কর্ম্মযোগ, ইহারই নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম। এই নিষ্কাম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাই গীতার পরতে পরতে উপদিষ্ট হইয়াছে।

কর্ম্মত্যাগের কথাও গীতায় উক্ত হইয়াছে বটে। যিনি জ্ঞানমার্গানুসারী, যিনি ধ্যানধারণাবিৎ, যিনি তপোনিরত, তিনি কর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন। তিনিও সন্ন্যাসী। আর যিনি নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিও সন্ন্যাসী। এই দ্বিবিধ সন্ন্যাসীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলে,

ভগবান নিষ্কাম-কর্ম্মী সন্ন্যাসীকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উত্তর দিয়াছেন।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥

এই শ্লোকের সহজ বাঙ্গালা অর্থ এইরূপ। "সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মঙ্গলকর বটে। কিন্তু উহার মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই বিশিষ্ট, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।"

এস্থলে টীকাকারেরা বলেন যে, যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, আত্মতত্ত্বজ্ঞানে যিনি অধিকারী হন নাই, তাঁহার পক্ষেই কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগের প্রাধান্য কথিত হইয়াছে। শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ হইলেও, কোন শাস্ত্রের সহিতই ইহার বিরোধ নাই। জ্ঞান বল, কর্ম্ম বল, সকলেরই লক্ষ্য সেই একই পথে। চিত্তশুদ্ধি বিনা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। চিত্তশুদ্ধির প্রধান সাধন কর্ম্ম। ভগবান বলিতেছেন—

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। টীকার তাৎপর্য্য বাঙ্গালাতেই বলি। "যাবৎ জ্ঞানোৎপত্তি না হয়, তাবৎ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য যে জ্ঞান তাহা লাভ হয় না। নতুবা পুরুষ কেবলমাত্র সন্ন্যাসেই সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিতে পারে না।"

তবে কর্ম্মত্যাগ কে করিতে পারে? যিনি আত্মাকে চিনিয়াছেন, আত্মানন্দ উপভোগেই যিনি সন্তুষ্ট, ভোগবাসনা যাঁহার চরিতার্থ হইয়াছে, তিনিই কর্ম্মত্যাগের অধিকারী। তাঁহার কর্ত্তব্য কিছুই নাই। কেন-না, পাপপুণ্যে তিনি আকাঙ্ক্ষাশূন্য, লাভালাভে তাঁহার প্রয়োজনাভাব।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥

কিন্তু ঈদৃশ ব্যক্তিও নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ করিলে করিতে পারেন। বরং করাই ভাল। কেন-না, নিজের লাভালাভ না থাকিলেও পরকে দৃষ্টান্ত দেখাইলেও সমাজের উপকার আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভগবান বলিতেছেন—

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

হে পার্থ! আমাকেই দেখ না কেন। এই ত্রিভুবনের ভিতর আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। সুতরাং আমার কর্ত্তব্যও কিছুই নাই। তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি। কেন-না, আমি যদি অনলস হইয়া কর্ম্ম না করি, তবে লোকে সর্ব্বথা আমার দৃষ্টান্তই অনুসরণ করিবে।

কর্ম্ম মাহাত্ম্যের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, এমন উৎকৃষ্ট প্রমাণ ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যিনি কর্ম্মফল-

দাতা, যাঁহাতে সমস্ত কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া জীব মোক্ষ-পথের পথিক হয়, তিনি স্বয়ং বলিতেছেন, আমার কর্ত্তব্য না থাকিলেও দেখ আমি কর্ম্ম করিতেছি।

জ্ঞান ও কর্ম্মমার্গের কথা উক্ত হইল। ইহা ছাড়া আর একটা পথ আছে, তাহার নাম ভক্তি। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান অর্জ্জুনকে ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। সে উপদেশের সার কথা এই—

মষ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি মষ্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥

আমাতেই মনঃস্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে দেহান্তে নিশ্চয়ই আমার সহিত এক হইয়া আমাতেই বাস করিবে।

ভগবানে চিত্ত বুদ্ধি স্থির করা ত সকলের সাধ্য নয়। তাহার উপায় কি? তিনি বলিতেছেন, অভ্যাস কর, চেষ্টা কর।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোসি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥

অভ্যাসেও যদি অসমর্থ হই?

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥

অভ্যাসেও অসমর্থ হইলে, ভগবান বলিতেছেন, আমা-রই কর্ম্ম কর। আমার প্রীত্যর্থ কর্ম্ম করিলেই, সিদ্ধিলাভ হইবে।

তবেই দেখ, জ্ঞানলাভেরও উপায় যেমন কর্ম্ম, ভক্তি-

লাভেরও উপায় সেই কর্ম্ম। কর্ম্মই সকলের মূল। গীতারও মূল কথা—অনাসক্ত চিত্তে, নিষ্কামভাবে নিয়ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্মং সমাচর॥

বৃথা-বৈরাগ্য-বিমুগ্ধ অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাই সমগ্র গীতাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সে কর্ম্ম আবার সে সে কর্ম্ম নয়,—প্রাণিহত্যা, স্বজনহত্যারূপ ঘোরতর নৃশংস কর্ম্ম। ভগবান বুঝাইয়া দিলেন যে, কর্ত্তব্য বলিয়া সেই নৃশংস কর্ম্মই অর্জ্জুনের পক্ষে তখন স্বধর্ম্ম, তাহা না করাই বরং অধর্ম্ম।

এখন কথা হইতে পারে, অর্জ্জুনের এত সৌভাগ্য কিসের? ভগবান তাঁহার সখা, ভগবান তাঁহার সারথি। জীব জন্মজন্মান্তরে সাধন করিয়াও যাঁহাকে পায় না, তিনি অর্জ্জুনের অশ্বরশ্মি ধরিয়া প্রিয়সখাকে পরমতত্ত্ব শুনাইতেছেন। এ সৌভাগ্য অবশ্যই অর্জ্জুনের পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে। সেও কর্ম্মমূলক। পূর্ব্বজন্মে সাধনার পথে যিনি যতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন, যে পরিমাণে যাঁহার যতটুকু চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তিনি সেইরূপ সংস্কার লইয়াই পরকালে জন্মগ্রহণ করিবেন। বালককাল হইতে এইজন্যই স্বভাবতঃ সকলেরই ভগবদ্ভক্তির তারতম্য দেখা যায়। ইহকালের দীক্ষা-শিক্ষা ও কর্ম্মানুষ্ঠানগুণে সেই ভক্তির আবার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অথবা অর্জ্জুন সম্বন্ধে আর একটা কথা আছে। কুরুক্ষেত্রের এই রথী-সারথি বৈকুণ্ঠের নর-নারায়ণ। ভূভারহরণে, ধর্ম্ম সংস্থা-

পনে, অবনীতলে অবতাররূপে উভয়ে পরস্পারের সহায়। তাই মানবকে প্রসঙ্গতঃ ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য হয় ত এই গীতামৃত ভগবানের মুখে বিনিঃসৃত হইয়াছে। অর্জ্জুনের মত এমন ভালবাসার ভাগ্য কার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে? কোন্ গুণে, কোন্ প্রেমের জালে পাণ্ডবরথী পরমেশ্বরকে বাঁধিয়াছিলেন তা জানি না; কিন্তু কত যোগী ঋষি, কত জ্ঞানী ভক্ত, কত বিশ্বপ্রেমিক যাঁহার বিশ্বরূপ খুঁজিয়া পান না, অর্জ্জুন তাই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। গীতাতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে অর্জ্জুন বিমুগ্ধ হইয়া, অর্জ্জুন তন্ময় হইয়া, প্রিয়সখার কাছে আব্দার করিয়া বলিলেন "প্রভো! তুমি যে বলিতেছ জগৎ আর কিছুই নয়, জগৎ আমারই রূপের বিকাশমাত্র, তবে তোমার সেই বিশ্বরূপ আমি একবার দেখিতে পাই না কি?" অর্জ্জুনকে ভগবানের অদেয় কিছুই ছিল না। অর্জ্জুনে তাঁহার অনন্ত প্রীতি। অনন্তপ্রেমের ভরে অনন্তদেব বলিলেন, "অর্জ্জুন! তবে দেখ। যাহা কেহ কখন দেখে নাই, তোমায় তাহা দেখাই একবার দেখ। চর্ম্মচক্ষে তুমি দেখিতে পাইবে না, তোমায় দিব্যচক্ষু দিলাম, একবার দেখ। দেখ, দেখ অর্জ্জুন! আমার কত রূপ, কেমন রূপ,—আশ্চর্য্য, অনন্ত, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অপরিমেয়। যাহা কিছু দেখিতে চাও, সকলই আমার এই দেহে আছে। দেখ, দেখ চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডখানা আমার এই বিরাট দেহে বিরাজমান।"

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।

এই বলিয়া কৃষ্ণসখা কৃষ্ণসারথি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করিয়া আপনার বিরাটরূপ প্রকটিত করিলেন। কত মস্তক কত চক্ষু, কত চরণ কত বাহু, তাহার সংখ্যা নাই সীমা নাই। কত বর্ণ কত মূর্ত্তি, কত আয়ুধ কত অলঙ্কার, দেখিয়া কি শেষ করা যায়? কত যক্ষ রক্ষ, কত দেব দানব, কত ঋষি তপস্বী, কত গন্ধর্ব্ব কিন্নর, কত মানবমণ্ডলী, কত ভূচর খেচর, কত অসংখ্য প্রাণী সেই দেহের ভিতর বিরাজমান। স্বর্গ নরক, আকাশ পৃথিবী, কত চন্দ্র সূর্য্য, কত গ্রহ উপগ্রহ, সকলই সেই বিরাটদেহে ঝলমল করিতেছে। অনন্ত রূপের অনন্ত বৈচিত্র্য। কোথাও সহস্র মার্ত্তণ্ডের জ্বলন্তচ্ছটায় নয়ন ধাঁদিয়া যায়, আবার কোথাও বা দিব্য কুসুমদামে, দিব্য গন্ধানুলেপনে মনঃপ্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে। মধুরে ভৈরবে, ললিতে কুৎসিতে, কোমলে কঠিনে, উজ্জ্বলে মলিনে বিশ্বরূপের বিশ্বমূর্ত্তি বিচিত্রিত। রূপের আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই। দেখিয়া অর্জ্জুন সভয়ে, সবিস্ময়ে, প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে ভক্তিগদ্গদ হৃদয়ে মস্তক নত করিয়া বলিলেন। "ঠাকুর! কে তুমি এইবার তোমায় দেখিলাম, এইবার তোমায় চিনিলাম। তুমি আদিদেব, তুমি সেই পুরাতন পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের আধার, তুমিই পরমধাম, তুমি সব জান, তোমাকে জানিলেই সব জানা হয়, তুমি অনন্তরূপে এই বিশ্বমণ্ডল ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছ।"

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ

স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

তোমায় প্রণাম করিব কোথায় ঠাকুর! চারিদিকেই যে তোমার মুখচক্ষু, চারিদিকেই যে তোমার করচরণ। তুমি সর্ব্বব্যাপী অনন্তশক্তি। অতএব সম্মুখে পশ্চাতে সর্ব্বত্র সকলদিকেই তোমাকে নমস্কার করি।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোসি ততোসি সর্ব্বঃ ॥

এই বিশ্বরূপী বিরাটমূর্ত্তি অর্জ্জুন আগে দেখেন নাই. আগে চিনেন নাই। কিন্তু না চিনিয়া না জানিয়াও অহেতুকী ভক্তির ডোরে ইহাঁকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ইহাঁকে হে সখা, হে কৃষ্ণ, হে যাদব ইত্যাদি পদে সম্বোধন করিতেন। ইহাঁর সহিত একত্র পানাহার, শয়ন উপবেশন করিতেন। পরিহাসচ্ছলে কখনও বা তিরস্কারও করিতেন। এখন দেখিয়া শুনিয়া সে সকলের জন্য ক্ষমা চাহিতেছেন। বলিতেছেন প্রভো! আমি অজ্ঞান,—আমি তোমার মহিমা ত জানিতাম না। তুমি যে অপ্রমেয় তাহা ত আমি বুঝিতাম না। অতএব এখন ক্ষমা কর দেব!

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথ বাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥

অর্জ্জুনের এই ভালবাসার পায়ে নমস্কার। মহাভারতের এই মহানায়কের চরণে কোটি কোটি নমস্কার! তাঁহার এ ভালবাসার সহিত অন্ত কাহারও তুলনাই হয় না। ভগবান নিজেই বলিয়াছেন, "দান বল ধ্যান বল, অধ্যয়ন বল অনুষ্ঠান বল, কিছুতেই আমার এ রূপ নরলোকে তুমি ছাড়া আর কেহ দেখিতে পায় না।"

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্নদানৈ
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্যোঽহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥

ইহজন্মে কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া, সংসারধর্ম্ম পালন না করিয়া, যাঁহারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে পূর্ব্বজন্মের সংস্কার-বশে তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত সাধারণ জীবের তুলনা করিতে যাওয়া বৃথা স্পর্দ্ধা বৈ ত নয়। ভগবানের প্রতি ভালবাসা তুমি আমি কতটুকু সাধন করিতে পারিয়াছি? আমাদের এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে বিশ্বপ্রেম কতটুকু ধারণা করিতে পারি? ভাল-বাসিতে কি আমরা জানি, ভালবাসিতে কি আমরা পারি? ভালবাসিতেন শুক্ল শঙ্কর, ভালবাসিতেন ধ্রুব প্রহ্লাদ, ভালবাসিতেন চৈতন্য গৌতম, ভালবাসিতেন কপিল নারদ,

ভালবাসিতেন বিদুর যুধিষ্ঠির, ভালবাসিতেন নন্দ যশোদা, ভালবাসিতেন উদ্ধব অক্রূর, ভালবাসিতেন শ্রীদাম সুদাম, ভালবাসিতেন চিত্রা চন্দ্রাবলী, আর ভালবাসিতেন,—

রাধা রাসেশ্বরী রম্যা পরমাচ পরাত্মিকা।
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণবক্ষস্থলস্থিতা ॥
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা নির্লিপ্তা নির্গুণা পরা।
বৃন্দাবনে চ বিজয়া যমুনাতটবাসিনী ॥
গোপাঙ্গনানাং প্রথমা গোপিকা গোপমাতৃকা।
সানন্দা পরমানন্দা নন্দনন্দনকামিনী ॥

আবার বলি, ইহাঁদের সহিত তোমার আমার তুলনা কি ভাই? অসাধারণের সহিত সাধারণের তুলনা কেন? তোমার আমার পক্ষে সেই সোজা পথ। এস ধাপে ধাপে পা দিয়া যদি ছাদে উঠিতে পারি। বৃথা লম্ফে ঝম্পে বিফল চেষ্টা করিয়া মরি কেন? শাস্ত্র আমাদের সাথী, যুক্তি আমাদের সহায়; ইহাঁদের নির্দ্দিষ্ট সরল পথে পদার্পণ করিয়া, পথের সম্বল সঞ্চয় করিতে করিতে এস ধীরে ধীরে অগ্রসর হই। বিশ্বপ্রেমশিক্ষা একটা শূন্য শিক্ষা নয়, উহা কিছু ধুকুড়ি মন্ত্র নয়, ভেলকি বাজী নয়। সংসারে আমার এখনও পূর্ণ মমতা, বাসনার দায়ে আমি এখনও বিব্রত, আমি কামনার ক্রীত কিঙ্কর, আমি কি ভাই বিশ্বপ্রেমিক? সৌন্দর্য্য দেখিলে আমি এখনও মোহিত হই, কুৎসিতে আমি এখনও ঘৃণা করি; আমি কি ভাই বিশ্বপ্রেমিক? আপনার ছেলেটিকে কোলে করিয়া আমি আদর করি, প্রতিবাসীকে পর বলি, আমি কি ভাই বিশ্বপ্রেমিক? রাজ-

মহিষীর চরণে আমি উদ্দেশে প্রণাম করি, কাঙ্গালিনী পায়ে লুটাইলেও গর্ব্বভরে কথা কহি না, আমি কি ভাই বিশ্ব-প্রেমিক? দুরন্তের দণ্ডভয়ে মাথা হেঁট করি, দুর্ব্বলের মাথায় পদাঘাত করি, আমি কি ভাই বিশ্বপ্রেমিক? যেখানে ফুলটি ফুটে, যেখানে নির্ঝর ছুটে; যেখানে বিহঙ্গ গায়, যেখানে তটিনী ধায়; যেখানে বালক হাসে, যেখানে যুবতী ভাষে; যেখানে মলয় বহে, যেখানে বসন্ত রহে; যেখানে বংশী বাজে, যেখানে রূপসী সাজে; যেখানে জ্যোৎস্না ফুটে, যেখানে সঙ্গীত ছুটে; কেবল সেই সেইখানেই আমার মনঃপ্রাণ পড়িয়া থাকে, আমি কি ভাই বিশ্বপ্রেমিক? পুত্রশোক-শল্য এখনও আমার হৃদয়ে গিয়া বিঁধে, গৃহিনী-হারা হইলে আমি এখনও আত্মহারা হই; রাগদ্বেষে আমার হৃদয় ভরা; অমুক শত্রু অমুক মিত্র, এই ভেদজ্ঞানে আমার বুদ্ধি কলুষিত; আমি কি ভাই বিশ্বপ্রেমিক? আমার পিতা আমার মাতা; আমার পুত্র আমার কন্যা; আমার ঘর আমার সংসার; আমার দেহ আমার প্রাণ, আমার জন্ম আমার মৃত্যু ইত্যাদি মায়ার কুহকে আমি এখনও প্রবঞ্চিত, আমি কি ভাই বিশ্বপ্রেমিক? বিশ্বপ্রেমিক তবে কাহাকে বলে? ভগবানকে ভালবাসিতে কে শিখিয়াছে, ভগবানের প্রিয়পাত্র কে হইতে পারে? তিনি নিজেই তাহার পরিচয় দিয়াছেন—

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি র্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥

"যাহার হর্ষ নাই, শোক নাই, দ্বেষ নাই আকাঙ্ক্ষা নাই, হিত নাই অহিত নাই; গৃহ নাই আসক্তি নাই; যে আমায় ভক্তি করে; তাহাকেই আমি ভালবাসি। শত্রু মিত্র, মান অপমান, শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ নিন্দা ও স্তুতিবাক্যে যাহার সমভাব; যে মৌনী, যে স্থিরমতি, যে সদা সন্তুষ্ট, সেই আমার ভক্ত, তাহাকেই আমি ভালবাসি।"

যিনি বিশ্বপ্রেমিক, সর্ব্বভূত তাঁহার সমান দৃষ্টি থাকা চাই। যিনি সমদর্শী, তিনিই তত্ত্বদর্শী। তাঁহার জানা চাই যে, পরমাত্মা সর্ব্বভূতেই সমভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন, আর জানা চাই যে এজগতের সমস্ত বিনষ্ট হইলেও তিনি কখনও বিনষ্ট হইবেন না।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি ॥

এ তত্ত্বজ্ঞান কেবল মুখে মুখে থাকিলে চলিবে না, কেবল বক্তৃতায় বলিলে চলিবে না; তাহা হইলে আমিও একজন তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিতে পারিতাম। বাস্তবিক আমার যদি সে জ্ঞান হয়, বাস্তবিক আমি যদি বুঝি যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্বের সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে পরমেশ্বর সমভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, বাস্তবিক যদি বুঝি যে এজগতে কেবলমাত্র তিনিই আছেন আর কিছুই নাই; তাহা হইলে আর আত্মপর ভেদ থাকিবে কেন, ভালমন্দ বোধ থাকিবে কেন, জরামরণের ভয় থাকিবে

কেন? তখন বুঝিব যে সবই ত তিনি। আমিও তিনি, ভ্রমে পড়িয়া যাহাদিগকে এক একটা সম্পর্ক বোধে সম্বোধন করি, তাহারাও তিনি; এই বৃক্ষশিলা-চেতন-অচেতন-সলিল-অনিল-অনল-আকাশময় বিরাট ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে একমাত্র তিনি ভিন্ন অন্য বস্তু আর নাই। তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং।" তাঁহা ছাড়া "তুমি" বলিয়া আর কোন পদার্থ নাই, কেন না তুমিও তিনি—"তত্ত্বমসি।" "আমি" বলিয়াও একটা পৃথক্ সামগ্রী নাই। আমিও তিনি—"সোঽহং।" ইহারই নাম বিশ্বপ্রেম, ইহারই নাম তত্ত্বজ্ঞান, ইহারই নাম বেদান্তের অদ্বৈতবাদ।

এই বিশ্বপ্রেমের আবেগভরেই, ভক্তপ্রধান প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, "হাঁ পিতঃ! ঐ স্তম্ভমধ্যেও আমার বিশ্বপতি অবস্থিতি করিতেছেন।" এই তত্ত্বজ্ঞানে মত্ত হইয়াই শুকদেব জন্মযোগী। এই অদ্বৈতবাদের মহিমা লইয়াই শঙ্কর সন্ন্যাসী। প্রকৃত সন্ন্যাসে অধিকার যাঁহার হইয়াছে, সন্ন্যাসী-কুল-শেখর শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবশ্যই বলিতে পারেন—

> ন মৃত্যুর্ণ শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ
> পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্মঃ।
> ন বন্ধুর্ণ মিত্রং গুরুনৈব শিষ্য
> শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
> অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো
> বিভুব্যাপি সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
> ন বন্ধন নৈব মুক্তির্ণ ভীতি
> শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥

এখন একবার ধীরে ধীরে, সবিনয়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে, আমাদের সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করি ভাই! শঙ্করের সন্ন্যাস-বাদে তোমার অধিকার হইয়াছে কি? আমাদের সন্ন্যাসী সুবোধ শান্ত, পণ্ডিত প্রেমিক, ধীর ধার্ম্মিক এ সকলই আমি স্বীকার করি; কেবল স্বীকার করি না যে তিনি সন্ন্যাসী। যে যে গুণ থাকিলে মানুষ সংসারে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে, সে সমস্ত গুণেই ইনি অলঙ্কৃত; তথাপি আমাদের সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নহেন। সাংসারিক প্রেমের ভগ্নাংশ লইয়া যিনি সংসার ত্যাগ করেন, তিনি সন্ন্যাসী নহেন। সাংসারিক ভালবাসার পিপাসা ইঁহার এখনও মিটে নাই, সে ভালবাসার বাসা এখনও ভাঙ্গে নাই, হৃদয়ের অতি নিভৃত কক্ষে প্রিয়জনবিরহের দুরন্ত-শিখা এখনও ধীকি ধীকি জ্বলিতেছে। নহিলে ইঁহার—

এখনও এখনও প্রাণ সে নামে শিহরে কেন?
এখনও স্মরিলে তারে কেন রে উথলে মন?

এখনও সেই কথা স্মরণ করিলে, সে কথার পরিচয় দিতে গেলে, এখনও সে বিষয়ের প্রসঙ্গ হইলে, এখনও ভালবাসার গান শুনিলে ইঁহার হৃদয়সাগরে বাসনার তরঙ্গ খেলিতে থাকে, কূলপ্লাবী সলিলধারা নয়ন ভেদিয়া বাহিরে বহিয়া যায়। ঐটুকুই ত রোগ, ঐটুকুর ক্ষয় না হইলে ত নিস্তার নাই। ইঁহার রোগের পরিচয় গিরিশ ভায়ার গানেই ত ধরা পড়িয়াছে—

অনুভবে বুঝা গেছে, মান হেন সাজায়েছে,
সকলি গিয়াছে কেবল আছে বঁকা নয়ন বিশেষ।

আমাদের সন্ন্যাসীর আর কোন রোগও যদি না থাকে, তথাপি ঐ বাঁকা নয়নটুকুতেই যে সব আট্‌কাইয়া আছে। ঐ আক্ষেপের অংশ, ঐ বাসনার বিন্দু যতদিন না নির্ম্মূল হইবে, ততদিন সন্ন্যাসধর্ম্মে ইহাঁর কোন অধিকার নাই, সন্ন্যাসব্রতে ইনি কদাচই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। সংসারে থাকিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে চিত্তের এই মলিনতা যে ঘুচিবার নহে, একথা এখন বলা কেবল পুনরুক্তিমাত্র। অতএব আমার বিনীত নিবেদন এই যে সন্ন্যাসী অনধিকার-চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া গৃহ প্রতিগমন করুন, পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করিয়া যথানিয়মে সংসারধর্ম্ম পালন করুন, তত্ত্ব-জ্ঞানমার্গের যেস্থান হইতে স্থানচ্যুত হইয়া বিপথে পদার্পণ কবিয়াছেন, তথা হইতে আবার আরম্ভ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ সোপানপরম্পরা লঙ্ঘন পূর্ব্বক পরমার্থের পথে অগ্রসর হইতে থাকুন। সংসারে গৃহস্থের কর্ত্তব্য অনেক আছে। দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ হইতে মুক্ত না হইলে তাঁহার পরি-ত্রাণ নাই। বংশলোপ না হয়, পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ না হয়, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে ত্রুটি না হয়, এ সকল তাঁহাকে অগ্রে দেখিতে হইবে। রমণীর ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। পতিসেবাই রমণীর পরম ধর্ম্ম। পতিই তাঁহার দেবতা। পতি বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিলে সাধ্বী তাঁহার অনুগমন করেন, পতি প্রাণত্যাগ করিলে তিনি তাঁহার সহগমন করেন, অথবা ব্রহ্মচারিণী হইয়া, সংসার-সন্ন্যাসিনীবেশে সংসারে থাকিয়া, নিষ্কামে কর্ম্মানুষ্ঠান করত ইহজীবনে পতিপদ ধ্যান করিতে করিতে মোক্ষধামে উপনীত হইতে পারেন।

রমণীর হৃদয়ও ভাবপ্রধান, উহা ভালবাসার আধারভূমি। তাই রমণীর পতিপ্রেম অনায়াসেই বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইতে পারে। সংসাররক্ষা, সংসার পালনের ভার পুরুষের হাতে। পুরুষ নিষ্কামভাবে সেই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। স্বর্গসুখ বা পরকালের ভোগবিলাসবাসনা পরিত্যাগ করুন; কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করুন; কর্ত্তব্যাচরণ করিয়া বলুন, "ইদং কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতং।" "ঠাকুর! আমি তোমারই কাজ করিলাম, কিন্তু আমি ইহার মূল্য চাহি না। ইহার ফল যা থাকে, তোমাতেই তাহা সমর্পণ করিলাম।" এইরূপে নিষ্কামচিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইয়া আসিবে, বাসনার বিলয় হইবে, তত্ত্বজ্ঞান স্ফূরিত হইবে। তারপর প্রকৃত বৈরাগ্যসঞ্চার হইলে অনায়াসে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিও, সাধনায় সিদ্ধ হইবে। আর তোমায় কাঁদিতে হইবে না, আর তোমায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে হইবে না। মায়ার আবরণ একবার উন্মুক্ত হইলে লক্ষ প্রলোভনেও আর তোমায় মোহিত করিতে পারিবে না। উপসংহারে শেষকথা সন্ন্যাসীকে বলি ভাই! সাংসারিক ভালবাসা যদি বিশ্বপ্রেমে পরিণত করিতে চাও, সাংসারিক ভালবাসা যদি ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিতে চাও, তবে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পথ ভুলিও না। পথ ভুলিলেই পথ বাড়িবে। এখন দিগ্‌ভ্রম যদি ঘুচিয়া থাকে, তবে ফিরিয়া সেই সোজাপথে আবার যাও। জ্ঞানচক্ষু ফুটিলে বৈকুণ্ঠের পথ, অনন্ত ভালবাসার, অনন্ত প্রেমময়ের পথ আপনা আপনি দেখিতে পাইবে। তোমার অবস্থা

হীন নয়, পথের সম্বল তোমার দ্বারা সহজেই সঞ্চিত হইবে, চরমস্থানে অনায়াসে উপনীত হইতে পারিবে।

আমার বক্তৃতার পর করতালি থামিলে, তিনজন সভ্য উঠিয়া একে একে তিনটি প্রস্তাব করিলেন। বন্ধু ব্রজরাজ লিলেন, "ভালবাসার সমস্ত বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ করা ইয়াছে, সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ভার সভা- ত গ্রহণ করুন। রসিকরঞ্জন প্রস্তাব করিলেন, "এই লবাসার সভা হইতে সভাপতিকে "প্রেমিকরতন" উপাধি দওয়া হউক।" আর স্বয়ং সন্ন্যাসী সভাপতির সহজপ্রাপ্য স্থবাদের প্রস্তাব করিলে, সকলগুলিই সর্ব্বজনসম্মতিক্রমে হীত ও সমর্থিত হওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

সভাভঙ্গের পর, সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে, সন্ধ্যার সময়, আমরা কয়েক বন্ধুতে নিভৃত কক্ষে বসিয়া সন্ন্যাসীকে চাপিয়া ধরিলাম যে নাম ধামের পরিচয় না দিলে কিছুতেই ছাড়িব না। অনেক তর্কের পর, নিজ পরিচয়বৃত্তান্ত তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিলেন। তাঁহার নাম শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ীর ঠিকানা আমি এ গ্রন্থে উল্লেখ করিব না। তাঁহারা দুই সহোদর; তিনিই জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠের নাম কুলশেখর। পিতামাতা উভয়েই অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। পল্লীগ্রামে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী পৈত্রিক সম্পত্তি ইহাঁদের যথেষ্ট আছে। ক্ষুদ্র জমীদারীর আয় বার্ষিক পাঁচহাজার টাকার কম নহে। জ্ঞাতি বন্ধুর যত্নে ইহাঁরা প্রতিপালিত। দুই সহোদরেই সুশিক্ষিত। শশীশেখর সংস্কৃত কলেজের এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; তিনি যখন গৃহত্যাগ করেন, তখন কনিষ্ঠ বি, এ, পাশ করিয়া আইন অধ্যয়ন করিতেছিলেন। কুলশেখর তখন বিবাহিত। শশীশেখরের বয়ঃক্রম এখন একত্রিশ বৎসর। পাঁচিশবৎসর বয়সে ইহাঁর বিবাহ হয়। কুলশেখর ইহাঁর অপেক্ষা দুই বৎসরের কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠের দুইবৎসর

পরেই কনিষ্ঠের বিবাহ হইয়াছিল। শশীশেখরের পত্নীর নাম কালিন্দী। কালিন্দীর পিতা মধুসূদন মুখোপাধ্যায় সঙ্গতিপন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোক; বিবাহকালে কালিন্দীর বয়স দশবৎসর ছিল। ত্রয়োদশে তিনি শশীশেখরকে সন্ন্যাসী করিয়া সংসারলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই।

এইবার রসিকরঞ্জন ভায়া সন্ন্যাসীকে আরও চাপিয়া ধরিলেন। "মহাশয়! ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা আপনাকে ভালবাসিতেন কি না আপনি কিরূপে জানিলেন? তিনি কি মুখরা ছিলেন? অজ্ঞান অবলার মুখের জ্বালায় কি আপনি তাঁহাকে প্রণয়বিমুখা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন? মুখরার প্রতি বিমুখ হইলে আমাকে ত দেশত্যাগ করিতে হয়। আমি এবিষয়ে ভুক্তভোগী। আমার ব্রাহ্মণীর পরিচয় সভাস্থলেই দিয়াছি, কিন্তু আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি মুখরা হইলেও আমি তাঁহাকে প্রণয়পণ্ডিতা বলিয়া জানি।"

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "না মহাশয়! আপনি যাহা বলিতেছেন, সে অভাগীর প্রকৃতি ঠিক তাহার বিপরীত ছিল। মুখরা দূরে থাকুক, তাহার মুখের কথা আমি কোনকালেই স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পাই নাই। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে সে আমার সহিত কোন কথাই কহিত না, আমি বার বার জিজ্ঞাসা করিলে তবে নিতান্ত সংক্ষেপে অতি মৃদু স্বরে কোন কথার উত্তর দিত। কতক কথা ঘাড় নাড়িয়াই সারিয়া দিত। আমার দিকে মুখ তুলিয়া সে কখন

কথা কহে নাই। আমার সহিত পতিপত্নী সম্বন্ধ আছে, আমি যে তাহার পরমাত্মীয়, এ কথা হয় ত তাহার মনেও উদয় হইত না। কিন্তু এই বয়সে কত রমণীকে পুত্রবতী হইয়া গৃহিণী হইতে ত দেখা গিয়াছে।”

এইবার আমিও থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, “ছি ছি শশীবাবু। আপনার এ বড় বিষম ভ্রম দেখিতেছি। অল্পবয়সে সকলের জ্ঞানোদয় হয় না। সকলের প্রকৃতি সমান নয়। যাহারা শান্ত, যাহারা সরল, লজ্জা যাহাদের প্রবল, বালিকাবয়সে কি তাহারা প্রণয়প্রকাশ করিতে জানে, না করিতে পারে? সে বালিকা, আপনি বয়স্থ। সে অবলা, আপনি পুরুষ। পিতামাতার অবর্ত্তমানে আপনার বিবাহ বেশী বয়সে হইয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বেই আপনার প্রণয়-লালসা জন্মিয়াছে; সে লালসা কি সে মিটাইতে পারে? সামান্য গানেই আছে—

না হলে রসিকা বয়োধিকা প্রেম কভু জানে না।

আর পুত্র প্রসব করিলেই কি প্রণয়যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেওয়া হয়? আপনি পণ্ডিত হইলেও রমণীহৃদয় পরীক্ষায় পটু নহেন। দেখিতেছি, আপনার ভুল কেবল সন্ন্যাসেই নহে,—সংসারেও আপনার বিষম ভুল ছিল।”

সন্ন্যাসী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “জগদীশ্বর জানেন! ভুল হয় ত আমার সমস্ত জীবনটা। কিন্তু সে ভুলে ত আমার ক্ষতি ছিল না। কালে হয় ত সে ভুল সংশোধন হইত। কিন্তু সংশোধনের সময় ত আর ভগবান দিলেন না।”

ব্রজরাজ জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার পত্নীর মৃত্যুদৃশ্য আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন কি? অন্তকালে তাঁহার কিরূপ অবস্থা দেখিলেন? লজ্জার আবরণ তখন অনেকটা মুক্ত হইয়া যায়। সে সময় আপনার দিকে চাহিয়া এক বিন্দু অশ্রুজলও কি তিনি ত্যাগ করেন নাই?"

সন্ন্যাসী শশীশেখরের চক্ষে এইবার জলধারা ছুটিল। সজল নেত্রে তিনি বলিলেন, "না, সে দৃশ্য আমায় দেখিতে হয় নাই। সে তখন পিত্রালয়ে ছিল। হঠাৎ, একদিন সন্ধ্যার সময় ডাকযোগে আমার শ্বশুরের পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে, 'কালিন্দী পীড়িতা, তোমার একবার আসা আবশ্যক।' তখন গাড়ীর সময় নাই। অতিকষ্টে অনিদ্রায় রাত্রিযাপন করিলাম। পীড়ার সংবাদ কিছুই খুলিয়া লেখেন নাই। মনে মনে কত তোলাপাড়া হইতে লাগিল। কত যুগের পর, রাত্রি প্রভাত হইলে রেলের ষ্টেসনে গিয়া টিকিট লইয়া আসিবার সময় শুনিলাম পাশের ঘরে, তারের বাবু, তারের যন্ত্র নাড়িতে নাড়িতে, মুখে মুখে উচ্চারণ করিয়া সংবাদ লিখিতেছেন—Kalindi died of cholera last night.—'কালিন্দী কালরাত্রে ওলাউঠায় মরিয়াছে।' আমার বুঝিতে আর বাকী রহিল না। মাথা ঘুরিয়া পড়িল। হাতের টিকিট ভূতলে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিলাম। আর রেলে চাপিলাম না, আর গৃহে গেলাম না। অজ্ঞান অভিভূত উন্মত্ত হইয়া তদবধি দেশে বিদেশে ঘুরিতে লাগিলাম। কতদিনের পর তা মনে নাই, কোনস্থান হইতে কনিষ্ঠকে এক পত্র লিখিয়া দিয়া তথা হইতে সরিয়া পড়ি-

লাম। লিখিলাম, 'ভাই! আমার আশা ছাড়িয়া দাও। কালিন্দী আমার মাথায় বজ্রাঘাত করিয়া পলাইয়াছে। ষ্টেসনেই আমি খবর পাইয়াছি। গৃহধর্ম্ম আমা হইতে আর হইবে না। তুমি কুলশেখর। ভগবান করুন, কুল-রক্ষা, সংসাররক্ষা তোমার দ্বারাই সম্পন্ন হউক। আমার সন্ধানে বৃথা সময় নষ্ট করিও না। আমার সন্ধান আর পাইবে না।' ইহার পর, এই তিন বৎসরে আর কোন চিঠি কখনও লিখি নাই। কোন সংবাদ কখনও পাই নাই।"

কথোপকথন এই পর্য্যন্ত হইয়াছে, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল দুইটি অপরিচিত ভদ্রলোক আমার সহিত দেখা করিতে চাহিতেছেন। আমি শশব্যস্তে উঠিয়া দ্বারদেশ হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলাম। গৃহপ্রবেশ মাত্র তাঁহারা দুইজনে সন্ন্যাসীর দুই হাত ধরিয়া প্রিয়সম্ভাষণ করিলেন। সন্ন্যাসী সাশ্রুলোচনে কথা কহিতে লাগিলেন। কথা ত ফুরায় না। তিন বৎসরের বিরহ-নিরুদ্দেশবার্ত্তা কি একদণ্ডে ফুরায়? কথাবার্ত্তা হইতে হইতে আমরা জানিলাম, একজন শশীবাবুর কনিষ্ঠ কুলশেখর; আর এক-জন তাঁহার শালীপতি ভাই, নাম আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার পত্নীর নাম জাহ্নবী। জাহ্নবী কালিন্দীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত কথোপকথন চলিল। এই তিন বৎসর ধরিয়া সন্ন্যাসীর স্বজনবর্গ তাঁহার সন্ধানে কত দেশ বিদেশে ঘুরিয়াছেন। মধুসূদন বাবু ও তাঁহার পুত্র ধরণীধর, আশুতোষ ও কুলশেখর পর্য্যায়ক্রমে, এক একবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসেন। বাটী আসিয়া আবার দিনকতক

পরে বহির্গত হন। কতবার ধরি-ধরি করিয়া ইঁহারা সন্ন্যাসীকে ধরিতে পারেন নাই। তিনি ত কোথাও স্থায়ী হইতেন না। এবার সন্ধান পাইয়া, বক্তৃতার বিবরণ শুনিয়া, চেহারার পরিচয়ে নিশ্চিত হইয়া আসিয়া ধরিয়াছেন। ধরিলে কি আর ছাড়াছাড়ি আছে? আশুবাবু বলিলেন, "আমার শ্বশুরের কনিষ্ঠা কন্যা সরস্বতী এখনও অবিবাহিতা, কিন্তু বিবাহযোগ্যা। তিনি বলেন, তাঁহার কন্যা থাকিতে, আপনার মত পাত্রকে কেন সংসারত্যাগ করিতে দিবেন?" সন্ন্যাসী অনেক পীড়াপীড়িতে গৃহে যাইতে স্বীকৃত, কিন্তু বিবাহে স্বীকৃত নহেন।

অনেক তর্কের পর, অবশেষে স্থির হইল, পরদিন প্রাতে শ্বশুরালয় হইয়া সন্ন্যাসী গৃহপ্রতিগমন করিবেন। আমাদিগকেও সঙ্গে যাইতে হইবে। পরদিন ব্রজরাজ আমি, রসিক ও গিরিশ, এবং উঁহারা তিনজন এই সাতজনে যথাকালে যাত্রা করা গেল। কতক রেলে, কতক নৌকায়, কতক গাড়ীতে পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে দিবা প্রায় অবসান হইয়া আসিল। পথে যাইতে যাইতে কুলশেখর ও আশুবাবু পূর্ব্বদিনের লিপিবদ্ধ বক্তৃতাগুলি পড়িয়া নিঃশেষ করিলেন। অপরাহ্ণে, গ্রামের অনতিদূরে একটা চটীতে বসিয়া সকলে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করা গেল। কেবল আশু বাবু তথায় অপেক্ষা না করিয়া অগ্রগামী হইলেন। বলিলেন, "এতগুলি ভদ্রলোক যাইতেছেন, আমি একটু অগ্রে গিয়া শ্বশুর মহাশয়কে সংবাদ দিলে ভাল হয় না?" আমরা সকলে সম্মত হইয়া তামাকু সেবন করিতে লাগিলাম।

দুই তিন ছিলিম্ তামাক পোড়াইয়া গিরিশভায়া স্বর ভাঁজিয়া গান ধরিতে যাইতেছেন, এমন সময় দেখা গেল সাত আট জন ভদ্রলোক আমাদের নিকট সাগ্রহে আসিয়া সমুপস্থিত। শশী বাবু আমার কাণেকাণে বলিলেন, ইহার মধ্যে আমার শ্বশুর মধুসূদন বাবু ও শ্যালক ধরণীধর আছেন। পিতা-পুত্রে শশব্যস্তে স্বজনসঙ্গে সকলকে লইতে আসিয়াছেন। সন্ন্যাসীর সহিত সেই স্বজনমণ্ডলীর সমাগম ও মিলনবার্ত্তা লিখিয়া আর গ্রন্থবিস্তারে প্রয়োজন নাই।

মধুসূদন বাবুর বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখি, সম্মুখে পূজার দালানে সভা প্রস্তুত। বৃদ্ধ পুরোহিত ও দুই একজন জ্ঞাতিকুটুম্ব সভাস্থলে বসিয়া আছেন। আমাদিগকে দেখিবামাত্র আশুতোষ বাবু নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মহাশয়! শশী বাবু বিবাহে সম্মত নহেন। আমিও বিবাহে জেদ্ করিব না। কিন্তু আমার অনুরোধ, কনে আজ দেখিয়া রাখুন। বিবাহ কোন্ আজই হইবে? আশ্বিন কার্ত্তিক দুইমাসের পরও যদি শশী বাবু মনঃস্থির করিতে না পারেন, তখন বিবাহ রহিত করা যাইবে। আজ কনে দেখিতে ক্ষতি কি?" আমরা সকলে সম্মত হইলাম, কিন্তু সন্ন্যাসী সকাতরে বলিলেন, "আমার এ দুর্দ্দিনে আমার উপর এ অত্যাচার কেন?"

আশুতোষ বাবু সে কথায় কাণ দিলেন না। তিনি সবেগে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মধুসূদন বাবু কোথায় গেলেন আর দেখিতে পাইলাম না। আমরা সভাস্থলে উপবিষ্ট হইয়া তামাকুসেবনে মগ্ন হইলাম।

সন্ন্যাসী মাথায় হাত দিয়া হেটমুণ্ডে বসিয়া রহিলেন; তাঁহার দৃষ্টি ভূমিতলে, প্রায় নিমীলিত। কিয়ৎক্ষণ পরে সবিস্ময়ে দেখিলাম—অপূর্ব্ব দৃশ্য! একদিকে আশু বাবু, আর একদিকে নবমবর্ষীয়া এক বালিকা, অনুপমলাবণ্যা-ভরণা পূর্ণযৌবনা ষোড়শী সুন্দরীর হস্তধারণ করিয়া সভা-স্থলে সমানীত করিলেন। সেই গোধূলিরাগরঞ্জিত প্রদোষ-কালে যেন সিন্দূরনিন্দিতা স্বর্ণকাদম্বিনী নিজকান্তি বিকাশ করিয়া পশ্চিম গগনপ্রান্তে সমুদিত হইলেন। সুন্দরী সভয়ে, সলজ্জে, সহর্ষে, সকাতরে, ঈষৎ কম্পান্বিত চরণে চলিয়াছেন; যেন সান্ধ্যসমীরণভরে প্রফুল্ল পদ্মিনী মৃণালশিরে সরোবরবক্ষে মৃদুমন্দ বিধূত হইতেছে। রমণী অবগুণ্ঠন-বতী। তথাপি লাবণ্যলহরী বসনবেলা অতিক্রম করিয়া উথলিয়া উঠিতেছে। কিন্তু এত যে লাবণ্য, ইহার উপর মালিন্যের এ ছায়া কেন? পশ্চিমাচলগামী পূর্ণিমার সুধাং-শুর ন্যায় সেই শোভা আছে, মুখের আভা যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে। মধ্যাহ্নমরীচিদগ্ধ কুমুদিনীর ন্যায় বর্ণের সেই মাধুরী আছে, বিকাশের গৌরব যেন নাই। বিস্ময়ের উপর বিস্ময় বাড়িল। নিকটবর্ত্তিনী হইলে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সীমন্তিনীর হাতে লোহা, সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু। সিন্দূরশোভা শিরোবসন আভাময় করিয়াছে। আমরা অবাক্ হইয়া পরস্পরে টেপাটিপি তাকাতাকি করিতে লাগিলাম। এই কি কুমারী, এই কি শশীশেখরের ভাবীপত্নী? এ দেশে এরূপ বিবাহ চলিত আছে নাকি?

কিন্তু কৌতূহলের আর অবসর পাওয়া গেল না। আশু

বাবু সেই অপূর্ব্ব রূপসীকে বসাইয়া, সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শশীবাবু! এইবার একবার মুখ তুলিয়া চাও,—এই নাও তোমার কালিন্দী।" শুনিবামাত্র সন্ন্যাসী বজ্রাহতের ন্যায় সচকিতে চাহিয়া, মূর্চ্ছিতপ্রায় হইতেছিলেন। আশু বাবু শশব্যস্তে সাদরে তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভাই স্থির হও, আমার কথা শুন। তোমার কালিন্দী মরে নাই। তারের খবরে যে কালিন্দীর মৃত্যু-সম্বাদ শুনিয়াছিলে, সে কালিন্দী নয়,—কালু নন্দী। তোমাদের গ্রামস্থ জমীদার জনরঞ্জন ঘোষের সদর নায়েব মফঃস্বলে গোমস্তার নিকাশ লইতে গিয়াছিলেন। নিকাশ শেষ না হইতে হইতে গোমস্তা ওলাউঠায় মরিল। তাহার নাম কালু নন্দী। কালু নন্দী তহবিল ভাঙ্গিয়াছিল, এখন নিকাশ না দিয়া মরিল; তাহার কাগজ-পত্র ও ঘর-সম্পত্তি আটক করা যাইবে কি-না, সেই হুকুম জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়ে, নায়েব মহাশয় জরুরী বোধে তাহার মৃত্যুসংবাদটা তারযোগে পাঠাইয়াছিলেন। তার-বাবুদের অগাধ বিদ্যা। যিনি সংবাদ পাঠাইলেন, তাঁহার বিদ্যাবলে; কিম্বা যিনি সংবাদ গ্রহণ করিলেন, তাঁহার গুণপনায়; অথবা হয় ত দুই-জনের বিদ্যার সাহায্যেই "কালুনন্দী" বিদ্যুদ্বর্ত্মে "কালিন্দী" হইয়া পড়িলেন। সেই "কালিন্দী" কাণে বাজিবামাত্রই শশী-বাবুও সংসার ছাড়িলেন। কাহার সংবাদ, কে পাঠাইল, শেষ-কথাই বা কি ছিল, জানিবার জন্য অপেক্ষা করিলেন না। কুলশেখর বাবু তাঁহার পত্র পাইলে, আমরা অনুসন্ধানে সব জানিলাম, সব বুঝিলাম। কালিন্দীর ওলাউঠা হয়

নাই, সামান্য জ্বর হইয়াছিল মাত্র। অল্পদিনেই সারিয়া গেল। ওলাউঠায় মরিলে তাহার পক্ষে ভাল ছিল বটে। সে মরণ একদিনে, না হয় তুইতিন দিনে হইত; তিন বৎসর ধরিয়া এমন করিয়া পুড়িয়া পুড়িয়া মরিতে হইত না। কালিন্দী যে বাঁচিয়া আছেন, এ সংবাদ আমি কল্য অবধি শশীবাবুকে দিই নাই। তাহার কারণ এই যে উনি তাহা শুনিলে, হয় ত তখনি তাহাকে দেখিবার জন্য অধীর হইয়া পড়িতেন। অধৈর্য্যের আতিশয্যে মূর্চ্ছা হইতে পারে। কালিন্দীকে আমি ত কাঁধে করিয়া লইয়া যাই নাই! আপনারা বলুন দেখি কোন্ ঔষধে সে অধৈর্য্যব্যাধি নিবারণ করিতাম? যিনি বালিকা-কালিন্দীর বয়োবৃদ্ধির অপেক্ষা না করিয়া তাঁহাকে প্রণয়-পরাঙ্মুখী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যিনি তারের সংবাদের আগাগোড়া না শুনিয়া কালিন্দীর মৃত্যুবার্ত্তা নিশ্চিত করিয়া লইয়াছিলেন, তিনি কি কালিন্দীকে না দেখিয়া কালিন্দীর জীবিতসংবাদে স্থির থাকিতে পারিতেন? এই জন্যই আমি কুলশেখরের সহিত এ বিষয়ে অগ্রে পরামর্শ করিয়াছিলাম, আর এই সকল আয়োজন করিবার জন্যই আপনাদিগকে ফেলিয়া অগ্রগামী হইয়াছিলাম। এখন কনে দেখা হইল, বিবাহ কি শশী বাবু রহিত করিতে বলেন?"

শশী বাবু আর মাথামুণ্ড বলিবেন কি? তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। দরবিগলিত ধারায়, গণ্ডস্থল ভাসাইয়া আনন্দাশ্রুপ্রবাহ ছুটিল। রোদন ভিন্ন এ সকল কথার উত্তর আর কি হইতে পারে!

আশুবাবু এইবার কালিন্দীকে ডাকিয়া বলিলেন, "কালিন্দি! সন্ন্যাসীর পায়ে, তোমার স্বামীর পায়ে এই-বার প্রণাম কর।" প্রণাম করিতে গিয়া, প্রেমময়ীর নয়-নাশ্রু আর লজ্জার বন্ধন মানিল না। বিরলে তিনি কত কাঁদিয়াছেন তা কে জানে? কিন্তু প্রকাশ্যে, লজ্জার খাতিরে, শ্বাসবারি সকলই ত চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে। আজ স্বামীসমীপে, সোহাগে, অভিমানে, হর্ষে, বিষাদে, সভার মাঝখানে তিন বৎসরের সেই রুদ্ধ প্রবাহ বালির বাঁধ ভাসাইয়া দিয়া সবেগে ছুটিল। সে অশ্রু কি সুন্দর! ত্রিভুবনের হাসিরাশি একত্র করিলেও বুঝি সে সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনা হয় না। প্রেমিকের পায়ে প্রেমময়ীর প্রণয়-বারি! যেন মন্দাকিনীর পূতধারা উচ্ছসিত সাগরবক্ষে সিঞ্চিত হইতেছে। যেন নিদাঘকাদম্বিনীর স্নিগ্ধবারি চিরোত্তপ্ত মরুক্ষেত্রে নিপতিত হইতেছে। যেন শীতাংশুর পীযূষরশ্মি চকোরের তৃষিতকণ্ঠে বর্ষিত হইতেছে। আর ন্ন্যাসী শশীশেখরের পক্ষে যেন—

পিপাসাক্ষামকণ্ঠেন যাচিতঞ্চাম্বু পক্ষিণা।
নবমেঘোজ্ঝিতা চাস্য ধারা নিপতিতা মুখে॥

ব্রীড়াবিড়ম্বিতা কালিন্দী, কোমল করপল্লবে দুই চক্ষের জলধারা মুছিয়া, গুরুজনের অনুরোধে, চিরসন্তাপিত, চিরবিরহিত স্বামীর চরণে প্রণত হইয়া, পার্শ্বোপবিষ্ট পুরো-হিতের চরণেও প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিত এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন, এইবার কথা কহিলেন। সম্পর্কে তিনি কালিন্দীর পিতামহস্থানীয়। তিনি বলিলেন, "কালিন্দি!

তোমার জলে কল্লোল নাই কেন? তোমার কল্লোল-কোলাহলে ক্রীড়া করিতে শশীশেখর বড় কুতূহলী। আমি আশীর্ব্বাদ করি এইবার তুমি কল্লোলময়ী হও, আর তোমার শ্রীকৃষ্ণ তোমার জলকল্লোলে কেলি করিতে করিতে বিরহ-কংস ধ্বংস করিয়া তোমার কল্যাণ বিধান করুন।”

কালিন্দী-জলকল্লোল-কোলাহল-কুতূহলী।
কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংসকুঞ্জর-কেশরী॥

সংসারলক্ষ্মী সংসারসন্ন্যাসীর পায়ে প্রণাম করিয়া, পুরোহিতের আশীর্ব্বাদ লইয়া, ধীরে ধীরে ললিতপদবিক্ষেপে অন্তঃপুরমধ্যে চলিয়া গেলেন। আমাদের বন্ধু ব্রজরাজ চিরতার্কিক। পুরোহিতকে হাতে পাইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, “মহাশয়! এমন চম্পকবরণীর নাম কালিন্দী কে রাখিল?” পুরোহিত উত্তর করিলেন, “মহাশয়! মার্জ্জনা করিবেন, এ নামটি আমার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে। মধুসূদনের মধ্যমা কন্যা, শৈশবে একদিন দোয়াতের কালি ঢালিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া নৃত্যকালী সাজিয়া লোলরসনা বিকাশে নাচিতেছিল; দেখিয়া আমি আদর করিয়া ডাকিলাম, ‘কালিঝুলি মাখিয়া এ কি রঙ্গ হইতেছে কালিন্দি!’ তৎপূর্ব্বে ইহার নাম কিছুই স্থির হয় নাই। সেইদিন হইতে সকলেই উহাকে আদর করিয়া কালিন্দী বলিয়াই ডাকিতে লাগিল। অতঃপর সেই কালিন্দী নামই চলিয়া গেল। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে ঘুচাইবে বল?, কালিন্দী না হইলে কালুনন্দীর মরণ উহাকে মরিতে হইবে কেন?”

সন্ন্যাসী শশীশেখরকে এইবার অন্তঃপুরে ডাক পড়িল। সেখানে সীমন্তিনীগণের হস্তে তাঁহার কি দুর্দ্দশা হইল তা জানি না, কিন্তু শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনির কোলাহলটা আমরা বহির্দ্দেশ হইতে শুনিতে পাইলাম। শুনিতে শুনিতে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আমরা সন্ধ্যাকৃত্য সম্পাদন করিতে উঠিলাম।

সন্ধ্যার পর, মজ্‌লিশ্‌ করিয়া ধরণীবাবুর বৈটকখানায় আমরা আড্‌ডা লইলাম। তথায় ঢোলক-তব্‌লা, সেতার তানপূরা প্রভৃতি সঙ্গীতের সরঞ্জাম সমস্তই আছে। আশু বাবু তব্‌লা পাড়িয়া বলিলেন, "আপনাদের ভিতর যদি কেহ গাহিতে পারেন, তবে আসুন না, একটু আমোদ করা যাক্।" বলিতে বলিতে শশী বাবু আসিয়া উপস্থিত। শশী বাবুর তখন আর সন্ন্যাসীবেশ নাই। প্রাতঃকালে আমাদের বাটী হইতে যাত্রা করিবার সময়েই আমি সে বেশ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু সন্ন্যাসীর সজ্জা শ্বশুরালয়ে দেখাইবার অভিপ্রায়েই বুঝি আশু বাবু তখন সে প্রস্তাবে বাধা দিয়াছিলেন। শ্বশুরবাড়ীর হিড়িকে পড়িয়া সন্ন্যাসী শশীশেখর এখন শশী বাবু হইয়া বসিলেন। গলা হইতে যূথিকার মালাগাছটা শশী বাবু খুলিয়া ফেলিতেছিলেন, আশু বাবু ও রসিকভায়া যেন মার্ মার করিয়া উঠিলেন। মালা ফেলা হইল না। মালা দুলিল—

মালা না দুলালে আপনি দোলে!

আশু বাবু মৃদুমন্দ হাস্যে বলিলেন, "ভায়া! অন্তঃপুরিকা-

গণের অনুরোধে পড়িয়া কালিন্দীর পায়ে প্রতিপ্রণামটা তোমায় করিতে হইয়াছিল কি ?" রসিকভায়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না হইয়া থাকে ত অন্যায়। আমি ব্রাহ্মণীর কাছে কি বলিয়া মুখ দেখাইব ? তিনি যখন কাণ ধরিয়া কৈফিয়ৎ চাহিবেন যে, তোমরা যে পাঁচজনে শালিসি করিয়া ভাল-বাসার মামলা মিটাইয়া দিলে, তাহার বিচার কি এমনি হইল ? যে অপরাধী সে প্রণাম না করিয়া, তাহার পায়ে নির-পরাধিনীকেই আবার প্রণাম করিতে হইল ? এ প্রণামের অর্থ কি ?"

ব্রজরাজ ধরিলেন, "প্রণামের অর্থ কি একটা হয় না ? অর্থ এমনও হইতে পারে যে 'স্বামিন্! তোমার পায়ে প্রণাম! সন্ন্যাসিন্! তোমার পায়ে প্রণাম!! পুরুষ! তোমার পায়ে অবলাজাতির সহস্র প্রণাম!!!"

গিরিশভায়া বিরক্ত হইয়া তখন বলিলেন, "প্রণামের অর্থবিচার তোমরা রাখ, আমি আর না গাইলে হাঁপাইয়া মরিব। আমার গানের কোন অর্থ থাকে, তোমরা এই অর্থে প্রয়োগ করিতে পার।" এই বলিয়া গায়ক তানপূরা ধরিয়া তান ছাড়িলেন। সেই জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর সৌন্দর্য্যে, খাম্বাজ-রাগিণীর মধুর মূর্চ্ছনা, অঙ্গে অঙ্গে মিশিয়া চারিদিকে অমৃতবিন্দু বর্ষণ করিতে লাগিল; আশু বাবুর মিঠা হাতে মধ্যমানের ঠেকা চলিল। গিরিশ গাইলেন—

দেখো ভুলো না এ দাসীরে ।
এই অনুরাগ যেন থাকে চিরদিন তরে ॥

তুমি বিনা অন্য আর, কি ধন আছে আমার;
প্রাণে যদি ও বদন-বিধু না হেরিলে পরে।
ফুলমাল আভরণ, পরিহরি সমুদয়,
সঁপেছি জনমের মত মনঃপ্রাণ তব করে।

গান শুনিয়া আমি বলিলাম, "প্রেমিকের পায়ে প্রেয়সীর প্রণামের অর্ঘ, ইহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছু আছে কি?"

সে রাত্রি আমরা মহাসমারোহে যাপন করিয়া, পরদিন বধূসহচারী শশীশেখরকে স্বগৃহে রাখিয়া, সকলে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে, শশীবাবুর ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া একবার গিয়াছিলাম। নিমন্ত্রণ, শশীবাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে। গিয়া দেখিলাম মহোৎসব ব্যাপার। শশী বাবুর যশে দেশ সমুজ্জল। নক্ষত্রপ্রতিম পুত্ররত্নকে কোলে লইয়া শশী বাবু স্বজনবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। শিশুর হাসিতে সংসার আলোকময় হইয়াছে। আমি আনন্দগদ্গদচিত্তে জিজ্ঞাসিলাম, "শশী বাবু! কেমন ভাই! ভালবাসার শিক্ষা সংসারে সার্থক হইতেছে কি?" রসিকরঞ্জন বলিলেন, "সন্ন্যাসের পথটা এখন নিকটে আসিল, না পিছাইয়া পড়িয়াছে?" শশী বাবু ঈষৎ হাসিলেন। ক্রোড়স্থ নবকুমারের নবনীতমুখে সে হাসি প্রতিফলিত হইল। শিশু হাসিভরামুখে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া দুইকরে তাঁহার অঙ্গ জড়াইয়া ধরিল। গিরিজাভায়া সেই সময় গান ধরিলেন; ললিতরাগিণীর ললিতলহরী গগনবিহারী কলকণ্ঠ সুরমাধুরিধারে ছুটিল;—